পশ্চিমবঙ্গে
বামফ্রন্ট সরকার

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার

সূচি

ভূমিকা

১। ভূমি সংস্কার ১২

২। পঞ্চায়েত ১৭

৩। কৃষি ২১

৪। সেচ ও ক্ষুদ্র সেচ ২৮

৫। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ৩৪

তাঁত শিল্প

৬। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ৪২

৭। ত্রাণ ৪৭

৮। উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন ৫৩

৯। শ্রম ৫৭

১০। শিল্প ও বাণিজ্য ৬২

১১। শিল্প পুনর্গঠন ৬৮

১২। গ্রামে জল সরবরাহ ৭০

১৩। শহরে জল সরবরাহ ৭৩

১৪। তফসিলী ও আদিবাসী কল্যাণ ৭৫

১৫। সুন্দরবন উন্নয়ন ৮০

১৬। ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন ৮৩

১৭। পার্বত্য উন্নয়ন ৮৬

১৮।	পশুপালন ও পশু চিকিৎসা	৯১
১৯।	স্বল্প সঞ্চয়	৯৫
২০।	শিক্ষা	৯৭
২১।	সমাজ-কল্যাণ	১০৩
২২।	খাদ্য ও সরবরাহ	১০৬
২৩।	সরকার পরিচালিত সংস্থা	১১০
২৪।	বিদ্যুৎ	১১২
২৫।	পরিবহণ	১১৬
২৬।	বন	১১৯
২৭।	পর্যটন	১২৫
২৮।	পরিবেশ	১২৯
২৯।	পূর্ত ও আবাসন	১৩১
৩০।	সমবায়	১৩৬
৩১।	স্থানীয় শাসন ও নগর উন্নয়ন	১৪১
৩২।	মৎস্য	১৪৫
৩৩।	আইন ও শৃঙ্খলা	১৪৮
৩৪।	স্বরাষ্ট্র (কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার)	১৫০
৩৫।	কারা	১৫২
৩৬।	বিচার	১৫৪
৩৭।	তথ্য ও সংস্কৃতি	১৫৬
৩৮।	ক্রীড়া	১৬৩
৩৯।	যুব কল্যাণ	১৬৬
৪০।	অসামরিক প্রতিরক্ষা	১৭২

ভূমিকা

বামফ্রন্ট সরকার তার শাসনকালের ৭ বছর পূর্ণ করেছে। বর্তমানের পুঁজিবাদী সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর দরুন এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতামূলক আচরণের ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থে গৃহীত বিভিন্ন কমসূচির রূপায়ণে আমাদের বিপুল সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। রাজ্যের সীমিত সম্পদ ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের সরকারের ন্যূনতম কর্মসূচির রূপায়ণের মধ্য দিয়ে আমরা আন্তরিকভাবে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বেশ কয়েকটি রাজ্য ও সারা দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষকে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা আমরা বোঝাতে পেরেছি। এই পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে রাজ্যগুলি আরও ভালভাবে জনগণের সেবা করতে পারবে এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও নৃগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় হবে।

এই পুস্তিকায় বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজকর্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমরা

২৮ বছরের কংগ্রেসী শাসনের কুফলগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি এবং সঙেগ সঙেগ সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দিয়ে চলেছি। গত ৭ বছরে পশ্চিমবঙেগ গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনা হয়েছে, রাজ্যের মানুষ ফিরে পেয়েছেন তাঁদের আত্মমর্যাদা। যৌথ সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা জনগণের কাছ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পাচ্ছি। পূর্বতন কংগ্রেসী আমলে বহু বছর ধরে শিক্ষাকে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল—আমরা শিক্ষাকে দিয়েছি অগ্রাধিকার। এক্ষেত্রে অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। গণ টোকাটুকি, দুর্নীতি ও পরীক্ষাসূচির অনিশ্চয়তা—এগুলি এখন অতীতের ঘটনা। রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রের অগ্রগতিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে জোর দেওয়ার দরুন সুফল পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্যের ক্ষুদ্রায়তন ইউনিটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে পশ্চিমবঙেগ লগ্নি বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত আমরা আমাদের বক্তব্য রেখে চলেছি। এ রাজ্যের কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে যদিও পশ্চিমবঙেগর প্রতি কেন্দ্রের অবিচার অপরিবর্তিতই রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এখনও আমাদের রাজ্যকে আধুনিক শিল্পের বিকাশ

থেকে বঞ্চিত করে চলেছে এবং এ রাজ্যের উন্নয়নের প্রতি তাদের অসহযোগিতামূলক মনোভাব দেখিয়ে যাচ্ছে। এমনকি এ রাজ্যে চালু কেন্দ্রীয় সরকারি ইউনিটগুলিকেও যথেষ্ট বরাত দেওয়া হচ্ছে না। এক দিকে যেমন এ রাজ্যে বহু বেসরকারি ক্ষেত্রে লাইসেন্স না দেওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে তেমনই শিল্পপতিদের তরফেও রাজ্যের আর্থিক বিকাশের ব্যাপারে অবহেলার নিদর্শন বিরল নয়। ইস্পাত ও লোহার ক্ষেত্রে সমহারে পরিবহণ মাশুলের কেন্দ্রীয় নীতির জন্য এবং কয়লার ক্ষেত্রে টেলিস্কোপিক হারের ফলে আমাদের রাজ্য তার প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অথচ পরিবর্তে শিল্পজ ও আর্থিক প্রয়োজনে আমরা কাঁচামাল নিয়ন্ত্রিত দরে পাচ্ছি না। কিন্তু এসব বাধা সত্ত্বেও আমরা শিল্পোদ্যোগীদের নানারকম সুবিধা দিয়ে রাজ্যে বিনিয়োগ বাড়াতে উৎসাহ দিচ্ছি।

অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক চিত্র আজ অনেক বেশি স্থিতিশীল। আমাদের শাসনকালে জীবনযাত্রার স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয়নি। আমাদের সরকার ধর্ম ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের এবং তফসিলী ও আদিবাসীদের পাশে আছে। সাংবিধানিক বাধা ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সৃষ্ট নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য রাজ্যের সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগৃহীত

হয়েছে। জনগণের চাহিদা মেটাতে আমরা কখনও কখনও ওভারড্রাফট নিতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সবগুলি রাজ্যে গৃহীত ওভারড্রাফট যোগ করলেও তা কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়ের একটা সামান্য অংশ মাত্র। বিধ্বংসী বন্যা ও পরপর দু'বছরের নজিরবিহীন খরার সময়ে এবং সম্প্রতি কলকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলায় প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের দিনগুলিতে সরকার জনগণকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। গত বছরে ভাল বর্ষা এবং আমাদের গৃহীত কিছু কিছু ব্যবস্থার ফলে এ বছর কৃষি উৎপাদন সর্বকালীন রেকর্ড স্পর্শ করেছে। এ ছাড়া বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে যে কাজের গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা সন্তোষজনক। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান এবং স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির ব্যাপারে পঞ্চায়েতের কর্মকাণ্ডে গ্রামবাসীরা শামিল হচ্ছেন–এই ঘটনা পল্লী পুনরুজ্জীবনের একটি আশাপ্রদ লক্ষণ। বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণে সকলের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অক্লান্ত প্রয়াস এখন খুবই প্রয়োজনীয়। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নেতিমূলক ও অনীহার মনোভাব বর্জন করতে হবে– কেননা, এতে জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। স্বার্থ নয়, আমাদের লক্ষ্য হবে সেবা। আমরা সবসময়ই জনগণকে এই লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করতে চাইছি। নিষ্ঠার

সঙেগ কাজের মধ্য দিয়েই আরও বেশি করে আমরা জনগণের সমর্থন লাভ করতে পারব এবং তাঁদের সচেতনতার স্তর আরও উন্নত করতে সক্ষম হব, যাতে তাঁরা কংগ্রেস দলের দ্বারা বিভ্রান্ত না হন। অতীতে এই দলের শাসনকালে এ রাজ্যে অপরিসীম ক্ষতি হয়ে গেছে। আমাদের কাজ নিপুণভাবে সম্পন্ন করার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মৌল ত্রুটিগুলি সম্পর্কে জনগণকে সজাগ রাখা আমাদের কর্তব্য। কেননা, পরিকল্পনাগুলির ত্রুটির ফলেই মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারি এবং ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ফারাক দিন দিনই বাড়ছে। আবারও আমরা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙেগ সঙগতি রেখে কাজ করার অঙগীকার গ্রহণ করছি।

মহাকরণ
২১ জুন ১৯৮৪

জ্যোতি বসু

পশ্চিমবঙ্গ — বিবরণ

আয়তন	–	৮৭,৮৫৩.০০ বর্গ কি. মি.
মোট জনসংখ্যা	–	৫৪,৫৮০,৬৪৭ (১৯৮১)
জনসংখ্যা (শহর)	–	১৪,৪৪৬,৭২১
জনসংখ্যা (গ্রাম)	–	৪০,১৩৩,৯২৬
জনসংখ্যা (তফসিলী)	–	১২,০০০,৭৬৮
জনসংখ্যা (আদিবাসী)	–	৩০,৭০,৬৭২
জেলার সংখ্যা	–	১৬
মহকুমার সংখ্যা	–	৪৯
ব্লকের সংখ্যা	–	৩৪১
থানার সংখ্যা	–	৩৪৪
মৌজার সংখ্যা	–	৪১,৩৯২
গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	–	৩,৩০৫
শহরের সংখ্যা	–	২৯১
পৌর সংস্থার সংখ্যা	–	১১১
শিক্ষিতের হার	–	৪০.৮৮ (২২,২৭১,৮৬৭)
শিক্ষিত (পুরুষ)	–	৫০.৪৯ (১৪,৩৯১,৮০৮)
শিক্ষিত (মহিলা)	–	৩০.৩৩ (৭৮,৮০,০৫৯)
মোট চাষযোগ্য জমি	–	৫,৫৭৫ হাজার হেক্টেয়ার
বর্গাদারের সংখ্যা	–	১২,৭৯,৯৪০ জন
মোট বনাঞ্চল	–	১১,৮৬,০০০ হেক্টেয়ার

পশ্চিমবঙ্গ

বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার কর্মসূচিসমূহের মূল লক্ষ্য হল গ্রামের সহায়সম্বলহীন কৃষক ও অসুবিধাগ্রস্তদের কিছুটা স্বনির্ভর হবার বনিয়াদ গড়ে তোলা এবং আইনগত অধিকারের ব্যবস্থা করা। কারণ, বর্তমান সরকার জানে যে এঁদের ভাগ্য পরিবর্তন ছাড়া রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। ১৯৫৩ সালে জমিদারি অধিগ্রহণ আইন এবং ১৯৫৪ সালে ভূমি সংস্কার আইন প্রণীত হলেও ভূমি সংস্কারের আসল কাজ শুরু হয় বামফ্রন্ট আমলে। মাঝখানে খানিকটা কাজ হয় ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট আমলে।

ভূমি সংস্কার চিত্র

	১৯৭৭	১৯৮৪ (ফেব্রুয়ারি)
১। নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা	২,৪২,০০০ জন	১২,৭৯,৯৪০ জন
২। ন্যস্ত কৃষি জমির পরিমাণ	১১,২২,০০০ একর	১২,৬৩,০০০ একর (১৯৮৩)
৩। ন্যস্ত জমি বিলির পরিমাণ	৬,১২,০০০ একর	৭,৭০,০০০ একর
৪। জমি বিলির ফলে উপকৃত জনসংখ্যা	৯.৬৩,০০০ জন	১৫,০০,০০০ জন
৫। বাজেট বরাদ্দ		২,৭৫২.৭ লক্ষ টা. (১৯৮৪-৮৫)

অপারেশন বর্গা কার্যক্রম পশ্চিমবঙ্গের চিরবঞ্চিত ভাগচাষীদের জীবনে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছে। ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বর্গাদার হিসাবে নথিভুক্ত হয়েছেন প্রায় ১২,৭৯,৯৪০ জন ভাগচাষী। এঁদের মধ্যে তফসিলী জাতি ৩,৭৬,৯০৭ জন এবং আদিবাসী ১,৫৫,৭১৫ জন রয়েছেন। নথিভুক্ত বর্গাদারদের মধ্যে তফসিলী জাতি ও আদিবাসীর আনুপাতিক হার জনসংখ্যার আনু-পাতিক হারের চেয়ে অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গ বাস্তুভিটা অধিগ্রহণ আইনানুযায়ী নভেম্বর ১৯৮৩ পর্যন্ত প্রায় ১,৭৫,৯৪৩ জন ক্ষেতমজুর, কারিগর, কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবীকে বাস্তুজমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। পাট্টা প্রাপকদের মধ্যে ৭১ হাজার জন তফসিলী জাতি এবং ৩৪ হাজার জন আদিবাসী। পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন অনুযায়ী জরিপ এবং খতিয়ান প্রণয়নের প্রাথমিক কাজও প্রায় সমাপ্তির পথে। শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মৌজায় প্রাথমিক কাজ শেষ হয়ে খসড়া প্রকাশনের কাজও অর্ধেকের বেশি মৌজায় সমাপ্ত হয়েছে। বর্গাদার এবং পাট্টা প্রাপকদের গ্রাম্য মহাজনের কবল মুক্ত করার জন্য ১৯৭৯ সাল থেকে তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ সাহায্য দান পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে। এঁদের খরিফ এবং রবিচাষের জন্য ঋণদান কর্মসূচিতে ১৯৭৯, ১৯৮০, ১৯৮১ এবং ১৯৮২ সালে যথাক্রমে ৫৯,১৯৪; ৭১,০৫৪,১,৭৫,৫৯০ এবং ৩,৭০,০০০

জনকে সাহায্যদান করা হয়েছে। ১৯৮৩ সালে খারিফ এবং রবি চাষে সাহায্যদানের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫.২৫ লক্ষ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ঋণ প্রাপকদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি তফসিলী জাতি এবং আদিবাসীভুক্ত সম্প্রদায়ের লোক। বিভিন্ন ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় উপকৃত ব্যক্তিদের প্রতি পাঁচ জনের দুজন হলেন তফসিলী এবং একজন আদিবাসী।

বর্গাদারদের সান্ধ্য বৈঠক

রাজ্যের ৫২ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে ৪৩ লক্ষ কৃষক পরিবারকে সমস্ত রকম খাজনা–করের দায় থেকে মুক্ত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিলের ওপর সম্মতিদান কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে। *এই বিল পাসে সম্মতি পেলে* ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন করা সম্ভব।

কৃষক সভাগুলি এবং পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রামের কৃষক, খেতমজুর ও গরিব মানুষের অধিকার ও মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত।

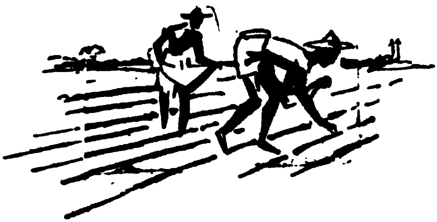

পঞ্চায়েত

পঞ্চায়েতী রাজের ধারণাটি নতুন নয়। ব্রিটিশ আমলেও ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড প্রভৃতি ছিল। কিন্তু, গ্রামের উন্নতির পরিবর্তে এসব ছিল শোষণের হাতিয়ার। ব্রিটিশের পুঁজিবাদী মনোভাবে গ্রামের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিভূমি ভেঙে পড়ে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও পঞ্চায়েত জোতদার-জমিদার গোষ্ঠীর শোষণের হাতিয়ার হয়েই থাকল। ১৯৭৭ সাল থেকে পঞ্চায়েতের ধারণাই পাল্টে গেল। আগে পল্লী উন্নয়ন র্কমসূচির সুযোগ-সুবিধা গ্রামের গরিব মানুষের কাছে পৌঁছত না, এসব কর্মসূচির সঙেগ তাঁরা জড়িতও থাকতেন না। পঞ্চায়েত আগে ছিল কায়েমী স্বার্থের কুক্ষিগত। ১৪ বছর ধরে পঞ্চায়েতে কোন নির্বাচনই হয়নি। ১৯৭৮ সালে প্রথম এবং ১৯৮৩ সালে দ্বিতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। এখন পঞ্চায়েত গ্রামের গরিবের বন্ধু, গরিব মানুষ পঞ্চায়েতের কাজকর্মে সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন।

ফ-২

পঞ্চায়েত আজ গ্রামের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

১৯৭৮ সালে নবগঠিত পঞ্চায়েতের নির্বাচনের মধ্য দিয়েই এটা সম্ভব হয়েছে। পঞ্চায়েতের ছাপ্পান্ন হাজার নির্বাচিত প্রতিনিধি গ্রামবাংলায় এক নতুন প্রাণের ছন্দ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের বর্তমান চেহারা নিম্নরূপ:

	১৯৭৮	১৯৮৩
১। গ্রাম পঞ্চায়েত	৩,২৪২	৩,৩০৫
২। পঞ্চায়েত সমিতি	৩২৪	৩৩৯
৩। জিলা পরিষদ	১৫	১৫

কোনরকম অতীত অভিজ্ঞতা ছাড়াই ১৯৭৮-এর সর্বনাশা বন্যার মোকাবিলায় পঞ্চায়েতের নবীন সদস্যদের ভূমিকা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। উদ্ধার, ত্রাণ এবং পুনর্নির্মাণের কাজে এঁদের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। ১৯৭৮ থেকে প্রথম চার বছরে পঞ্চায়েত কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচি অনুযায়ী ১৪ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করেছে। ৭১,৩৫৯ কি. মি. রাস্তা তৈরি করেছে, ৪৩,৩৭৭ হেক্টেয়ার ডোবা জমি উদ্ধার

করেছে এবং ৯ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছে। ত্রাণ ও কল্যাণ দপ্তর গত পাঁচ বছরে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ৯০০ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা এবং ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৪৯ মে. টন গম ব্যয় করেছে। কৃষি বিভাগের উন্নত জাতের বীজের জনপ্রিয়তা বাড়াতে ও নতুন ফসলের চাষে কৃষকদের সাহায্য করতে মিনিকিট বিতরণ প্রকল্পটি পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে রূপায়িত হচ্ছে। গত বছর মৎস্য

পঞ্চায়েতের উদ্যোগে পুষ্করিণী সংস্কার

দপ্তর পঞ্চায়েতের সুপারিশক্রমে মাছ চাষীদের ২২৫ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছে। গত তিন বছরে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প দপ্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ৫ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা খরচ করে ৫৭টি বিপণনকেন্দ্র চালু করেছে। চার হাজার জায়গায় পানীয় জল সরবরাহ, ৭৮টি নার্সারী, ৩৭৫টি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি, বাস্তুহারাদের জন্য ৫২ হাজার বসত বাড়ি ও ৪,৬০০টি স্কুল বাড়ি তৈরি বা মেরামত করেছে পঞ্চায়েত। এছাড়াও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের জন্য ১,১২,৩২৩টি বাড়ি নির্মিত হয়েছে।

৮,৭০০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু হয়েছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। পঞ্চায়েতের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের জন্য সরকার ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের সহায়তা বিশেষ লক্ষণীয়। এদের সহায়তার ফলে এখন পর্যন্ত ১২,৭৯,১৪০ জন বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৭১-৭২ সালে যেখানে পঞ্চায়েত ৮৬ লক্ষ টাকা কর আদায় করত সেখানে ১৯৮০-৮১ সালে আদায় করেছে ১৭০ লক্ষ টাকা। এসবের ফলে গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, পঞ্চায়েত গ্রামবাংলার জীবনে নতুন প্রাণের ছন্দ বয়ে এনেছে।

উল্লেখ্য চলতি আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত বিভাগের জন্য ৪৩,৬১,১৫,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

কৃষি

পাশ্চমবঙেগ ৮০ শতাংশ লোক কৃষি ও কৃষিভিত্তিক পেশার উপর নির্ভরশীল। রাজ্যের মোট আয়ের ৫০ শতাংশ এবং মোট কর্ম সংস্থানের ৬০ শতাংশই কৃষিনির্ভর। কৃষিই এ রাজ্যের সার্মগ্রিক অর্থনীতির মূল স্তম্ভ। মোট কৃষি জমির ৬০ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক চাষ করেন এবং বাকি ৪০ শতাংশ মাঝারি ও বিত্তবান কৃষকদের হাতে। উৎপাদনের সঙেগ সংশ্লিষ্ট খামারগুলির ৯০ শতাংশেরও বেশি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরাই পরিচালনা করেন। এখানে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ৫৫,৭৫,০০০ হেক্টেয়ার। চাল উৎপাদনে পশ্চিমবঙগ ভারতে দ্বিতীয় এবং মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনে চতুর্থ। দেশের ৬০ শতাংশ পাট এবং ২৫ শতাংশ চা উৎপাদন করে এ রাজ্য।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিচিত্র

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮৪-৮৫
১। আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ –	৩,৫২২.৪৩ লক্ষ টাকা	৬,৭৭০.০১ লক্ষ টাকা (১৯৮৩-৮৪)
২। মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ –	৫,৫৭৫ হাজার হেক্টেয়ার	৫,৫৭৫ হাজার হেক্টেয়ার
৩। চালের উৎপাদন –	৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন	৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন
৪। গমের উৎপাদন –	১০.৫১ লক্ষ টন	১০ লক্ষ টন
৫। পাটের উৎপাদন –	৩৪.৭০ লক্ষ বেল	৪৫ লক্ষ বেল
৬। আলুর উৎপাদন –	১৬.৫৭ লক্ষ টন	২৬ লক্ষ টন
৭। ডালের উৎপাদন –	৩.৫১ লক্ষ টন	৩.৫০ লক্ষ টন
৮। খাদ্যশস্যের বার্ষিক গড় উৎপাদন –	৭৫ লক্ষ টন (৭২-৭৭)	৭৮ লক্ষ টন ('৭৭-৮২)

কৃষকের উন্নতি ছাড়া কৃষির উন্নতি সম্ভব নয়। তাই ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর যুগপৎ কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেন। চাষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষ, যাঁরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল, তাঁদের সঠিক কল্যাণবিধান এবং কৃষিক্ষেত্রে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে নানা প্রকল্প রচিত হয়।

১৯৭৮–৭৯ সালে বিধ্বংসী বন্যা এবং ১৯৮১–৮২ সালে প্রচণ্ড খরার ফলে কৃষি উৎপাদনে দারুণ বিঘ্ন ঘটে এবং প্রায় সাড়ে পাঁচশো কোটি টাকার ফসল বিনষ্ট হয়। কৃষি জমিরও প্রচুর ক্ষতি হয়।

কিন্তু, এইসব প্রাকৃতিক ও অন্যান্য বাধা সত্ত্বেও কৃষির ক্ষেত্রে গত সাত বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ১৯৭২–৭৩ থেকে ১৯৭৬–৭৭ এবং ১৯৭৭–৭৮ থেকে ১৯৮১–৮২ সালের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে দেখা যাবে যে প্রথম পাঁচ বছরে খাদ্যশস্যের বার্ষিক গড় উৎপাদন ছিল ৭৫ লক্ষ টন এবং দ্বিতীয় পাঁচ বছরে ৭৮ লক্ষ টন। ঐ সময়ে প্রথম পাঁচ বছরে অর্থাৎ '৭৭ পর্যন্ত চালের বার্ষিক গড় উৎপাদন ছিল ৬২ লক্ষ টন। পক্ষান্তরে পরবর্তী পাঁচ বছরে অর্থাৎ ৭৭–৮২ এই পাঁচ বছরে চালের বার্ষিক গড় উৎপাদন বেড়ে হয় ৬৭ লক্ষ টন। পশ্চিমবঙ্গে আমন চালের

উৎপাদনের উপরই মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রধানত নির্ভর করে। ৭২-৭৭ এই পাঁচ বছরে আমন চালের বার্ষিক গড় উৎপাদন ছিল ৪৬ লক্ষ টন, ৭৭-৮২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫২ লক্ষ টন। এই সময়ে গড় ফলনের পরিমাণ জাতীয় স্তরের গড় ফলনের বেশি হয়েছিল। ১৯৭৭-৭৮ সালে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ৮৯.৭ লক্ষ টন এবং ১৯৮০-৮১ সালে শুধু

আমনের (চাল) মোট উৎপাদন ৬০.২ লক্ষ টন পশ্চিমবঙ্গের সর্বকালীন রেকর্ড। পশ্চিমবঙ্গ এখন আলু, পাট, মেস্তা প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদনে স্বয়ম্ভর।

বামফ্রন্ট·আমলে গৃহীত কিছু কিছু ব্যবস্থার ফলে এ বছর কৃষি উৎপাদন সর্বকালীন রেকর্ড অতিক্রম করেছে।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রতিবছর প্রায় এক লক্ষ হেক্টেয়ার নতুন এলাকায় ভূমি ও জল-সংরক্ষণের নানা ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। গত সাত বছরে এ রাজ্যের কৃষকদের চাহিদা মেটাতে প্রায় ২১০ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন শস্যবীজ আমদানি করা হয়েছে—যা পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় অনেক বেশি। বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে রাজ্যকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য রাজ্য বীজ কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে। গরিব কৃষকদের বহুবিধ ফলনে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে গত সাত বছরে এরাজ্যে ৫০,৩৩,২৭৬টি মিনিকিট বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৭৯-৮০ সালে এ রাজ্যে প্রথম শস্যবীমা প্রকল্প চালু হয়। আমন, আউশ ও বোরো ধান এবং আলু এর আওতাভুক্ত হয়েছে। ছোট, প্রান্তিক চাষী ও ভাগচাষী বীমা বাবদ যে প্রিমিয়াম দিয়েছেন তার ৫০ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসাবে দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৮০-৮১ সালে ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম এ রাজ্যে কৃষকদের

বার্ধক্য ভাতা চালু হয়েছে। পেনশনভোগীর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নীও পেনশন পাচ্ছেন।

দেশ স্বাধীন হলেও জোতদার ও সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে বাংলার কৃষক মুক্তি পায়নি। ১৯৭৭ সালের আগে পর্যন্তও বর্গাদার, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীকে জোতদার ও সুদখোর মহাজনদের কাছে থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে হত। ফলে জোতদারের ইচ্ছা ও স্বার্থ অনুযায়ী 'উৎপাদন নীতি' নির্ধারিত হত। সে উৎপাদন নীতি সমাজকল্যাণের পক্ষে শুভ ছিল না। কৃষকরাও চড়া সুদের বোঝা বইতে না পেরে ঐ সুদখোর জোতদারদের কাছে নিজেদের সব কিছু খুইয়ে বসতেন। তাছাড়া কৃষক তাঁর ফসল ঘরে তোলার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁর ফসলের নায্য মূল্যও পেতেন না।

কৃষিক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের নীতি হল যিনি চাষ করবেন তিনি নিশ্চিন্তভাবে নিজের ঘরে ফসল তুলবেন। বর্তমান সরকার বর্গাদার ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য সমবায়, ব্যাংক প্রভৃতি থেকে নামমাত্র সুদে ও সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা করেছে। 'মিনিকিট' বিতরণও করেছে। ফলে চাষীরা আজ জোতদার শ্রেণীর খেয়ালখুশির পুতুল নন। তিনি আজ নিজের জমিকে সম্পূর্ণ নিজের করে ভাবতে শিখেছেন। ফলে, যথাসাধ্য শ্রমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রয়াসী

হয়েছেন। সরকারের পক্ষ থেকে চাষীর ফসলের ন্যায্য মূল্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সেচ ও ক্ষুদ্র সেচ

রাজ্যের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির কথা স্মরণে রেখে বামফ্রন্ট সরকার কৃষির জন্য অপরিহার্য সেচ ব্যবস্থার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সেচ চিত্র

	১৯৭৬-৭৭ লক্ষ টাকায়	১৯৮২-৮৩ লক্ষ টাকায়	১৯৮৪-৮৫ লক্ষ টাকায়
১। সেচে আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ–	৬,৫৩৯.৮৭	–	১৪,৭৩৮.৬৯
২। ক্ষুদ্র সেচে আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ–	২,০৭৬.৩৯	–	
৩। সেচ-প্রাপ্ত জমির পরিমাণ–	৩৯.৪৭,০০০ হেক্টেয়ার	৫৫৩৫০০০ হেক্টেয়ার	৯,১৬৮.৮৯
৪। ক্ষুদ্র সেচ-প্রাপ্ত জমির পরিমাণ–	১,১৮১.৬০ হা. হে.	১,৪৬৬.০৬ হা. হে.	১,৫২৬.৬৮ হা. হে. (লক্ষমাত্রা)
৫। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে স্যালো টিউবওয়েলের সংখ্যা	৭৮,০৯৩ টি	–	২ লক্ষের বেশি

ময়ূরাক্ষী, ডি ভি সি এবং কংসাবতী প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সেচের জলের সবটুকুই ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে বামফ্রন্ট সরকার। পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এর কাজ শেষ হলে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলার ৮.৯৪ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হবে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী বছর থেকে এই সেচ প্রকল্প মারফত জল পাওয়া সম্ভব হবে।

হিংলো, সহরাজোড়, কুমারী ও কন্ধু প্রকল্প সমেত ১৯৭৭ সাল থেকে গৃহীত ২০টি সেচ প্রকল্প মারফত ২৯.২৪ হাজার হেক্টেয়ার জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। আরো ৪.৮৯ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিকে সেচযোগ্য করে তোলার আশায় (১) আপার কংসাবতী, (২) সুবর্ণরেখা ব্যারেজ, (৩) দ্বারকেশ্বর, (৪) গাজোল জল উত্তোলন, (৫) বামনী গোলা–হবিবপুর জল উত্তোলন, (৬) টাঙগন· উপত্যকা, (৭) অজয় জলাধার, (৮) সিদ্ধেশ্বরী নিয়ন বিল–এই আটটি বৃহৎ সেচ প্রকল্প হাতে নিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার।

গত সাত বছরে ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে এবং ২.৮৫ লক্ষ হেক্টেয়ার নতুন জমি. ক্ষুদ্র সেচের আওতায় এসেছে। ব্যয়বহুল প্রকল্পের বদলে অসংখ্য ছোট ছোট প্রকল্প রূপায়ণের উপর গুরুত্ব দেওয়ায় চাষীরা বেশি উপকৃত হয়েছেন।

১৯৮৩-৮৪ সালে ২০০টি গভীর নলকূপ মঞ্জুর করা হয়। গত সাত বছরে ৫৫০টি নদীজল উত্তোলন প্রকল্প তৈরি হয়েছে। অগভীর নলকূপের সংখ্যা ৭৮,০৯৩ থেকে গত সাত বছরে বৃদ্ধি পেয়ে এখন দাঁড়িয়েছে দুই লক্ষের উপর। চাষের জমিতে মূল ক্যান্যাল থেকে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল কাটা হয়েছে। রাজ্যের এক ফসলী জমিকে বহু ফসলী জমিতে পরিণত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বিশেষ

তিস্তা বাঁধ-প্রকল্প—রূপায়ণের পথে

দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ৩৭,৬৬০ **বর্গ** কিলোমিটার বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের ১৪.৯৮ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৭৮-এর নজীরবিহীন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সেচ প্রকল্পগুলির মেরামতের কাজে ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ১৯৮১ সালের ঝড়ে বিধ্বস্ত সুন্দরবন অঞ্চলে ২১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এছাড়াও খরাপ্রবণ অঞ্চলে গত সাত বছরে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনসাধারণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

ক্ষুদ্র সেচ বিষয়ে পূর্বতন সরকারের সঙ্গে বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির মূল পার্থক্য :

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র সেচের রূপায়ণ বিষয়ে পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ পূর্বতন সরকারের আমলে ক্ষুদ্র সেচে তেমন নজর পড়েনি। ১৯৭৬ সাল থেকে সরকারি টাকায় গভীর নলকূপ বসানো বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান সরকার আবার গভীর নলকূপ বসানো শুরু করেছে। দ্বিতীয়তঃ আগে ধারণা ছিল, ময়ূরাক্ষী, দামোদর ও কংসাবতী প্রভৃতি প্রকল্পগুলির জলাধার থেকে বড় বড় ক্যান্যালের মাধ্যমে জল সরবরাহ করলে সেচ সফল হতে পারবে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় সেচ এলাকার শেষ সীমা পর্যন্ত জল সরবরাহ করা যাবে না বুঝতে পেরে বর্তমান সরকার ছোট ছোট ‘মাঠনালার’ মাধ্যমে সেচ প্রকল্প চালুর ব্যবস্থা করেছে। তৃতীয়তঃ, ১৯৮২ সালের খরার তিক্ত

অভিজ্ঞতার পর এ রাজ্যের চাষীরা ক্ষুদ্র সেচের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁরা ছোট ছোট 'মাঠনালা'র জন্য জমি ছেড়ে দিয়ে সরকারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছেন। চতুর্থতঃ, পূর্বতন সরকারের সময় বোরো চাষের জন্য সরকারের মাধ্যমে গভীর নলকূপ থেকে জল নিলে চাষীকে প্রতি একরে ৯৬ টাকা কর দিতে হত আর 'ক্ষুদ্র সেচ নিগমে'র মাধ্যমে নিলে প্রতি একরে ৪৮০ টাকা দিতে হত। বর্তমান সরকার উভয় ক্ষেত্রে ২৪০ টাকা কর ধার্য করে এ বৈষম্য দূর করেছে। ফলে চাষীদের মধ্যে অসন্তোষও আর নেই। পঞ্চমতঃ, বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচের ব্যাপক প্রসারে জোর দেওয়া হয়েছে। 'হাইড্রলিক র্যাম' প্রকল্পের মাধ্যমে পাহাড়ি এলাকায় সেচের ব্যবস্থা একটি নতুন নজির। জীবন বীমার সঞ্চয়ের একটা মোটা অংশ গ্রামীণ চাষীদের থেকে আসে। অথচ এই জীবন বীমা এতদিন সেচ সম্প্রসারণের জন্য সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাই করেনি। বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে সহজ শর্তে ঋণের প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে। আগে কৃষিতে যেখানে মাত্র ৪ শতাংশ বিদ্যুৎ ব্যয় করা হত, বর্তমানে সেখানে ১০ শতাংশ ব্যয় করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সব শেষে বলা যায়, বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর থেকে ক্ষুদ্র সেচ সম্বন্ধে চাষীদের মধ্যে একটা সামগ্রিক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও জাগরণ দেখা দিয়েছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

১৯৭৮ সালে এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম শিল্পনীতি ঘোষণা করে। তার আগে কোন নির্দিষ্ট শিল্পনীতি ছিল না। এই শিল্পনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়। ১৯৭৮ সালে রাজ্যের ১৫টি জেলায় ১৫জন জেনারেল

ম্যানেজার নিযুক্ত হন। জেলা স্তরে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটানো এঁদের কাজ। ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন স্বেচ্ছানির্ভর। তবু রেজিস্ট্রেশনের হার থেকে এক্ষেত্রে অগ্রগতির একটা ছবি পাওয়া যায়:

	১৯৭৭ পর্যন্ত	১৯৮২-৮৩ পর্যন্ত
রেজিস্ট্রিকৃত ইউনিটের সংখ্যা	৯৬,৬২৬	১,৭০,৩৬৬

গত কয়েক বছরে ইলেকট্রনিক্স শিল্পেরও বেশ প্রসার ঘটেছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে এ ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি-কৃত নতুন শিল্পের সংখ্যা ছিল ৫৬ এবং ১৯৮২-৮৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫০টিতে। গত পাঁচ বছরে স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন ২,৫৪২টি ক্ষেত্রে ঋণ দিয়েছে। এর মধ্যে ২,৫০৩টিই হল ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য। এই সংস্থা ১৯৭৫ সালে ঋণ মঞ্জুর করেছিল ৯০.৪৪ লক্ষ টাকা আর ১৯৮৩ সালে ঋণ মঞ্জুর করেছে ৬৪৭.৪৪ লক্ষ টাকা।

স্টেট এড টু ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী স্বল্প সুদে ১৯৭৭-৮২ সময়কালে ঋণ মঞ্জুর করা হয় ৩৩৩.৭৫ লক্ষ টাকা, পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে দেওয়া হয় মাত্র ৫২.৫৩ লক্ষ টাকা। অনুন্নত এলাকাগুলিতে শিল্প বিকাশের জন্য ১৯৭৬-৭৭ সালে সাহায্য দেওয়া হয় ২৫.৬৪ লক্ষ

টাকা, আর পরবর্তী পাঁচ বছরে দেওয়া হয় ৩৬০.৭৪ লক্ষ টাকা। ১৯৭৯-৮০ সালে এ রাজ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সংখ্যা ছিল ১৪। এখন হয়েছে ২৮। এইসব এস্টেটে এসময়ে চালু ইউনিটের সংখ্যা যথাক্রমে ৪২০ এবং ৮৪০। ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশের জন্য রাজ্য সরকার হাওড়া ও জলপাইগুড়ি জেলার ৫০ একর জমি

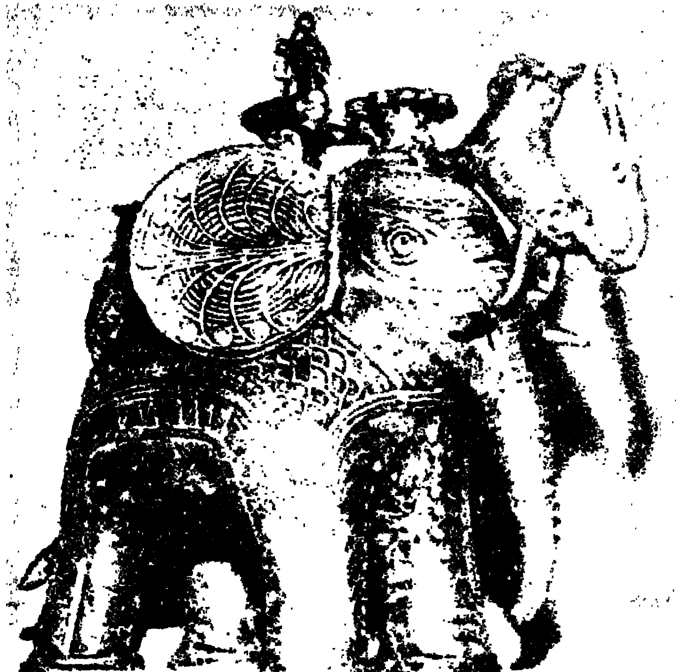

উন্নয়নের দায়িত্ব নিয়েছে। এইসব শিল্প পরিচালনার জন্য ১৯৭৯-৮০তে যেখানে ২৫৬ জনকে ট্রেনিং দেওয়া হয় সেখানে ১৯৮৩-৮৪ তে ট্রেনিং পেয়েছেন ৫৪১ জন। বামফ্রন্ট সরকার শুধু উৎপাদন নয়, বিপণনের ক্ষেত্রেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। নবগঠিত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ১৬৭টি বিপনন কেন্দ্র থেকে ১১৭.৯৪ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র বিক্রয় করা হয়েছে।

নিবিড় গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে ১৯৮১-৮৩ সালে ৪০,২৪৫ জনকে ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনের জন্য দেওয়া হয়েছে ৩৪৩.২ লক্ষ টাকা। খাদি ও গ্রামীণ পর্ষদ ঐ সময়ে ১৮২.৬৭ লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে গত পাঁচ বছরে ১,১৪,৪৪২ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা ও উৎসাহদানের ফলে গত সাত বছরে ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প রাজ্যে যে ব্যাপক ও অতুলনীয় প্রসারতা লাভ করেছে, এটা অনস্বীকার্য।

তাঁত শিল্পে

পশ্চিমবঙ্গে কৃষির পরেই তাঁত শিল্পে নিয়োজিত জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বামফ্রন্ট আমলে সামগ্রিকভাবে তাঁত শিল্পের বিকাশ ও তাঁত শিল্পীদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে একাধিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে জোর দেওয়া হয়েছে তন্তুবায় সমবায় সমিতি গঠনের উপর। ১৯৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত যেখানে মোট ১০% তাঁত শিল্পী বিভিন্ন সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সেখানে ১৯৮২-৮৩ সালে ৩১.৪% শিল্পী সমিতিগুলির অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ১৯৭৭ এর পূর্ববর্তী সময়ে সমবায় সমিতি স্থাপনের কাজ শুরু হলেও এগুলির কাজকর্ম পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রেই বহু ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে। বহু ক্ষেত্রে এগুলি পরিচালিত হত বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর দ্বারা। এই পরিপ্রেক্ষিতে বামফ্রণ্ট আমলে মোট ১৪০ টি মডেল হ্যান্ডলুম কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপন করা হয়। এছাড়া নিজস্ব তাঁত নেই এরূপ শিল্পীদের

নিয়েও গত কয়েক বছরে মোট ২৭টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে।

গত ৭ বছরে আর বি আই স্কিমে রাজ্যের তাঁত শিল্পে প্রায় ১০ কোটি টাকার ঋণের সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। পূববর্তী আমলে কার্যত এই স্কিমের কোন সুযোগই নেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকার পরিচালিত তন্তুজ, তন্তুশ্রী এবং মঞ্জুষা প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত তাঁত বস্ত্র বিপণনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে তন্তুজ এবং তন্তুশ্রীর বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২.৪১ কোটি এবং ৪.৬৯ লক্ষ টাকা। ১৯৮২-৮৩ সালে এই পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ২২ কোটি এবং ৫.৪২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

এছাড়া তন্তুজ ও তন্তুশ্রী হ্যান্ডলুম অ্যান্ড টেক্সটাইল ডিরেকটরেট এবং উইভারস সার্ভিস সেন্টার তাঁত শিল্পীদের নতুন নতুন ডিজাইন এবং আধুনিক কারিগরি ব্যাপারে অবহিত করতে উদ্যোগ নিয়েছেন।

সর্বোপরি প্রয়োজনবিশেষে তাঁত শিল্পীদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য ১৯৮০ সাল থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কিম খোলা হয়েছে।

তাঁত শিল্পের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপ

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮২-৮৩
১। সমবায়ের আওতায় তাঁত শিল্পের সংখ্যা	৭৬,৬৭৪	৯৭,৭০৪
২। লক্ষ মিটার হিসাবে তাঁতের উৎপাদন	২,০৭০	৩,০৭০
৩। লক্ষ মিটার হিসাবে সমবায়ের আওতায় তাঁতের উৎপাদন	৬৬২	১,৩৯০
৪। মডেল সমবায় সমিতির সংখ্যা	০	১০৭
৫। হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নিযুক্ত শিল্পীর সংখ্যা	৫,০৯,৭১০	৭,১০,০২৬
৬। হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা	১,৯৮,৫৮৫	২,৫৬,৫৫৩
৭। জনতা কাপড়	০.৪৫ (বর্গ মিটার)	২২.৭৬ (বর্গ মিটার)

গত ৭ বছরে রাজ্যের রেশম শিল্পে বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। বামফ্রন্ট আমলে রেশম চাষ ১৮,১৫৭ একর থেকে বেড়ে ২৯,১৪৫ একরে দাঁড়িয়েছে। গত কয়েক বছরে রেশমজাত বস্ত্রের বিক্রির বিবরণ নিম্নরূপ:–

১৯৭৬-৭৭	২১,০৬,২৩৯ টাকা
১৯৮২-৮৩	১,০৩,২৪,২৪০ টাকা

তাছাড়া বর্তমানে সিল্ক উৎপাদন ৪.০৫ লক্ষ কে.জি. থেকে বেড়ে ৭ লক্ষ কে.জি.তে পৌঁছেছে। ১৯৭৬-৭৭ সালের আগে পর্যন্ত প্রতি একরে গড়ে ২২কে.জি. সিল্ক উৎপন্ন হত। ১৯৭৬-৭৭ এর পরবর্তী সময়ে একর প্রতি ২৪ কে.জি. সিল্ক উৎপন্ন হচ্ছে।

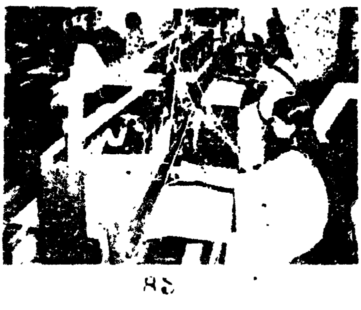

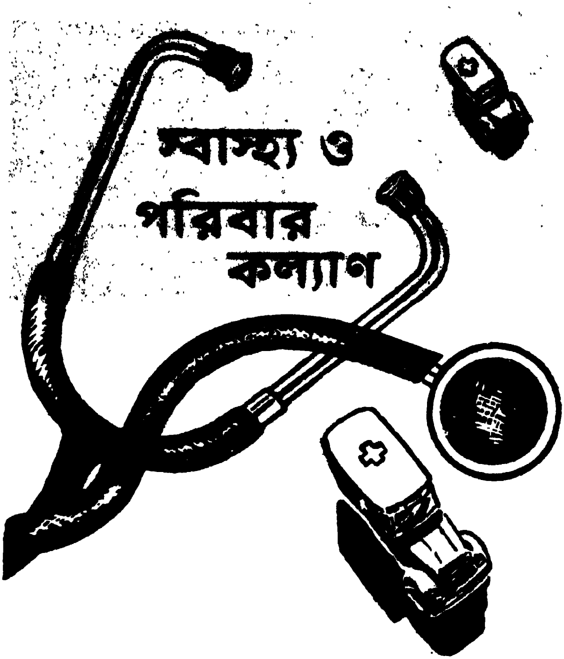

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া আমাদের মত দরিদ্র দেশে সকলের জন্য সুষম স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্ভব নয়—একথা মনে রেখেও বামফ্রন্ট সরকার স্বাস্থ্য খাতে ভারতের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক ব্যয় করছে। এই খাতে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ বার্ষিক ৩৭.৮৬ টাকা।

ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে ১৯৭৭ পর্যন্ত আমাদের দেশে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ছিল মূলতঃ শহরকেন্দ্রিক। বামফ্রন্ট সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে গ্রামমুখী করে তোলার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের দিকে। চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে রোগ প্রতিরোধের উপর।

গ্রামীণ চিকিৎসাকেন্দ্র

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য, পরিবেশ, পাবলিক হেলথ এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ একযোগে কাজ করছে, এগিয়ে এসেছে পঞ্চায়েত এবং বহু জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কমিটি। এরই ফলে যে সাফল্য এসেছে নিচে প্রদত্ত তালিকা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ:

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮৪-৮৫
১। স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয় বরাদ্দ	৭০,৭৬,৫২,০০০ টা.	২৫৬,১১,৪৮.০০০ টা.
২। মাথাপিছু ব্যয় বরাদ্দ	১৫ টা.	৩৭.৮৬ টা.
৩। হাসপাতালের একজন চিকিৎসকের প্রারম্ভিক বেতন	৬৯৪.৭০ টা. বাড়ী ভাড়া বাদে	১,৪৭৩.৭০ টা. বাড়ী ভাড়া বাদে
৪। হাসপাতালের সংখ্যা (শহর)	৩৪০	৩৮১
৫। ঐ (গ্রামীণ)	২	১৯

৬। স্থায়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	২৮১	৩০৯
৭। সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৭১৮	৮০৮
৮। সাব সেন্টার	১,০০৫	৪,৫১৫
৯। হাসপাতালে স্বাস্থ্য কর্মী	১১,০০৫	১৭,৯২৬
১০। " শয্যা সংখ্যা	৫২,৬২৪	৫৯,১২৯
১১। অধিগৃহীত হাসপাতাল	২০	৩৮
১২। কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র	৩৯	৪৩
১৩। টি. বি. হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা	৪,৬৬০	৫,৯৪৮
১৪। পরিবার পরিকল্পনায় সাহায্যপ্রাপ্ত দম্পতির সংখ্যা	৭৫ লক্ষ	৮৬ লক্ষ
১৫। ইনটার্নীদের মাসিক ভাতা	২৭৫ টা.	৪৫০ টা.
১৬। জুনিয়র হাউস স্টাফের ভাতা	৪০০ টা	৫৫০ টা.
১৭। সিনিয়র হাউস স্টাফের ভাতা	৫০০ টা.	৬৫০ টা.

রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ কর্মসূচিতে গত সাত বছরে ১০,৮৯৩টি নতুন নলকূপ বসানো হয়েছে, পুনঃপ্রোথিত করা হয়েছে ২০,৫৮৭টি। এছাড়া পাথুরে এলাকায় রিগের সাহায্যে বসানো নলকূপের সংখ্যা ১১,০৩৮টি। নলবাহিত জল সরবরাহ কর্মসূচিতে ১,২৭২.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৬ টি প্রকল্প মারফত মোট ২১৭টি গ্রামে নলের সাহায্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে কয়েক লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। এজাতীয় আর একটি প্রকল্পে আরো ৮৮২টি গ্রামে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে ২,৪৩৮.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং উপকৃত হয়েছেন ১.১৫৮.৬৬ লক্ষ মানুষ। প্রতি গ্রামে একটি করে জল উৎস স্থাপন কর্মসূচি অনুযায়ী ১১,২৮০টি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে—এটি মোট চাহিদার প্রায় অর্ধেক। কেন্দ্রীয় সাহায্য পাওয়া গেলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলার সব গ্রামে জল সরবরাহ সম্ভব হবে।

হাসপাতাল পরিচালনা এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সমস্ত কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলিকে সচল ও শক্তিশালী করা, ডাক্তারী শিক্ষায় নৈরাজ্যের অবসান ঘটানো, পথ্য ও ওষুধের ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা দূর করা, সর্বোপরি জনস্বাস্থ্যের সচেতনাবৃদ্ধির জন্য বিরাট উদ্যোগ গ্রহণ, হাসপাতালগুলির সার্বিক উন্নতি সাধন ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করা বামফ্রন্ট সরকারের উল্লেখযোগ্য অবদান।

ত্রাণ

ত্রাণ বিভাগের মূল কাজ হল, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, শারীরিক পঙ্গু ও অক্ষম ব্যক্তিদের জীবনধারণের উপযোগী ব্যবস্থা করা এবং কৃষিকাজে মন্দার মরশুমে দুঃস্থ কৃষক, ক্ষেত মজুরদের সাময়িক কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা। ১৯৭৭ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এ দায়িত্ব দৃঢ়ভাবে পালন করে চলেছেন। ১৯৪৭-৮৪ পর্যন্ত ত্রাণ খাতে আর্থিক ব্যয়ের সমীক্ষা :-

১৯৪৭-৭৭ (৩১.৩.৭৭)	১৯৭৭-১৯৮৩-৮৪
২২৫ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা	১৭০ কোটি টাকারও বেশি
(৩০ বছরে গড় ৭ কোটি ৫১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা)	(৭ বছরে গড় ২৪ কোটি টাকারও বেশি)

১৯৭৭–'৮৪ পর্যন্ত বিভিন্ন বছরে ব্যয়ের পরিমাণ

সাল	বিপর্যয়ের বিবরণ	ক্ষতির পরিমাণ	ব্যয়িত অর্থ ও খাদ্যশস্যের পরিমাণ
১৯৭৭-৭৮	বন্যা	৯৪ হাজার বাড়ি নষ্ট, ৩১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার ফসল নষ্ট	১২ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা, ৬০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য
১৯৭৮-৭৯	বন্যা	১,৮২৪ জনের জীবনহানি, ২ লক্ষ ৭৫ হাজার গবাদি পশুর মৃত্যু, ১৪ লক্ষ বাড়ি নষ্ট, ২০৮ কোটি টাকার ফসল নষ্ট	৫২ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা, ২,১০,৫৫০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য। (অন্য বিভাগের খরচ ধরা হয়নি)

৫	১৯৭৯-৮০	খরা	৭০ শতাংশ কৃষিকার্য ব্যাহত	২৪ কোটি ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, ১,২০,০০০ মেট্রিক টন গম,
	১৯৮০-৮১	শিলাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, আসাম থেকে আগত উদ্বাস্তু	৬৫ জনের জীবনহানি, ২ লক্ষ ৬৮ হাজার বাড়ি নষ্ট	১৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা
	১৯৮১-৮২	খরা, ঘূর্ণিঝড়	১৯৮ জনের জীবনহানি, ৫২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ফসল নষ্ট, ৯২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার সরকারি/বেসরকারি সম্পদ নষ্ট	১৪ কোটি ৮৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা

১৯৭৭–'৮৪ পর্যন্ত বিভিন্ন বছরে ব্যয়ের পরিমাণ

সাল	বিপর্যয়ের বিবরণ	ক্ষতির পরিমাণ	ব্যয়িত অর্থ ও খাদ্যশস্যের পরিমাণ
১৯৮২-৮৩	খরা (নজিরবিহীন)	২ কোটি লোক ক্ষতিগ্রস্ত	৩৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা
'৮৩—২৪.১.৮৪	ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, বন্যা	৫২,৫০০ বাড়ি নষ্ট, ৩৩ জনের জীবনহানি ৯ কোটি টাকার ফসল ক্ষতি	১৭ কোটি টাকা

গত ৭ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের উল্লেখযোগ্য কাজ :

(১) কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প চালু করা, (২) পর পর বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলা, (৩) আসাম থেকে বিতাড়িত মানুষদের সাময়িক আশ্রয় ও ত্রাণ সাহায্য বাবদ ৪৫ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ব্যয়, এবং (৪) 'রিলিফ ম্যানুয়াল' সংশোধনের মারফত প্রকৃত জনকল্যাণকামী ও সুষ্ঠু ত্রাণনীতি রচনা।

১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে ১৯৮৩-৮৪ সালের জানুয়ারি মাস অবধি ত্রাণ বিভাগ কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সর্বমোট যে অর্থ ও খাদ্যশস্য বরাদ্দ করেছে তার পরিমাণ হলো যথাক্রমে ১১২ কোটি ৮২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা; ৬৩,৫৩,২৪১ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য। যে সকল ত্রাণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার হিসাব নিম্নে বিবৃত হল :

	অর্থ (টাকার অংক লক্ষে)	খাদ্যশস্য মেট্রিক টন
১। খয়রাতি সাহায্য	৩,৭৩৮.৪৩	১,১৪,৮০০
২। কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও কর্মমুখী প্রকল্প	৪,৩৩৪.৫৪	১,৭৫,৮৭৫
৩। গ্রামীণ পুনর্গঠন প্রকল্প	৫০০.০০	৪৩,৮১৬
৪। গৃহনির্মাণ অনুদান	২,৭০৯.৭৫	১৮,৭৫০
মোট:	১১,২৮২.৭২	৩,৫৩,২৪১

১৯৭৮-৭৯ থেকে ১৯৮৩-৮৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস অবধি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও অনুরূপ কর্মমুখী প্রকল্প রূপায়ণে গ্রামাঞ্চলে ৬৭,০০০টি পুরাতন রাস্তা সংস্কার, ৫,১৯৩টি নতুন রাস্তা নির্মাণ, ৪২,৪১৬টি খাল ও পুষ্করিণী সংস্কার, ২১,৪৯১টি ক্ষুদ্র সেচ ও কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ৪,১৫২টি বাঁধ সংস্কার, বন্যায় বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত ১৩,৪৫,০০০ গৃহের সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ, ২৩,৭৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন সংস্কার বা নির্মাণ, ৫১,০০,০০০ বৃক্ষ রোপণ ও ১৮,০০০ বিবিধ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন

১৯৬১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে একটা কথা সরবে প্রচার করা হত যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাকি রয়েছে সামান্য কিছু সমস্যা। আগাগোড়া একটা ভুল হিসেব এবং ভ্রান্ত নীতির উপর দাঁড়িয়ে এসব কথা প্রচার করা হত। আসলে, আমাদের স্বাধীনতার বলি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে ১৯৭৭ পূর্ববর্তীকালে একটা দায়সারা মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে। সঠিক ও বাস্তব মূল্যায়নের অভাব, খাপছাড়াভাবে কলোনি উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া, যথাযথ ব্যবস্থা না করে শিবির বন্ধ করে দেওয়া এবং অনেক জায়গায় প্রয়োজন থাকতেও ডোল বন্ধ করে দেওয়া প্রভৃতি অমানবিক কাজের ফলে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রকৃত কাজ অনেক অনেকখানি পিছিয়ে ছিল। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতাসীন হবার পর বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে এলেন দরদী মনোভাব নিয়ে। দেখা গেল, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুর আসল সংখ্যা হল ৭৬ লক্ষ ৫০ হাজার।

এঁদের স্থায়ী ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য ৭৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এ টাকা কেন্দ্রের কাছে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিশেষ সাড়া পাওয়া যায়নি। শহর ও গ্রাম এলাকায় বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে জবর দখল করা জমির স্থায়ী স্বত্ব অর্পণ করা প্রয়োজন। বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর কেবলমাত্র গ্রাম এলাকায় স্থায়ী স্বত্ব অর্পণের ব্যাপারে কেন্দ্রকে রাজী করাতে পেরেছে কিন্তু শহর এলাকায় স্থায়ী স্বত্ব দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রের আপত্তি রয়েছে। কেন্দ্র আপাততঃ ৯৯ বছরের স্বত্ব দিতে রাজী হয়েছে এবং বামফ্রন্ট সরকারের চাপে স্বত্ব অর্পণকারী দলিল বহুলাংশে উদ্বাস্তু স্বার্থবাহী করা হয়েছে। এই স্বত্ব দলিল দ্রুত অর্পণ করার জন্য বহু বিশেষ সাব রেজিস্ট্রার নিয়োগ করা হয়েছে। দলিল প্রাপকদের কোর্ট ফি ও রেজিস্ট্রেসন ফি মকুব করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯,২৩৬টি দলিল রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। বিভিন্ন কলোনির রাস্তা, নর্দমা, কালভার্ট তৈরি এবং জলসরবরাহ ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। গত সাত বছরে ৬০,৬০০ প্লটের উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে। হোমে বসবাসকারীদের পুনর্বাসনের নীতিতে পরিবর্তন এনে উদ্বাস্তু মহিলাদের পুনর্বাসনের বয়ঃসীমা ৪৫ থেকে ৬০ বছর করা হয়েছে। রাণাঘাট কুপার্স ক্যাম্পের ৩৭১টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হয়েছে চলতি বছরে। গত সাত বছরে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে আরো যে

সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সেগুলি হল–

(১) আগে ১৬.১২.৭১ তারিখের পূর্বে আগত উদ্বাস্তুদের স্বীকৃতি দেওয়া হত। বামফ্রন্ট সরকার ঐ তারিখের পরেও যাঁরা এসেছেন তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। (২) ১৯৬৩ সালের পরে আগত উদ্বাস্তুরা বাস্তুজমি পাবার অধিকারী ছিলেন না। বামফ্রন্ট সরকার বৈষম্য দূর করে এইসব পরিবারকেও বাস্তু জমি পাবার যোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। (৩) ১৯৭৭ পূর্ববর্তী কালে উদ্বাস্তুদের বাস্তু জমি পেতে হলে জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন বাবদ একটা খরচ বহন করতে হত। বামফ্রন্ট সরকার এ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে বিনা ব্যয়ে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। (৪) একইভাবে পূর্ববর্তী ব্যবস্থা রদ করে উদ্বাস্তু এলাকায় বিনামূল্যে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জমি দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। (৫) খাস জমিতে বসবাসকারী এবং আবাদরত উদ্বাস্তুদের পাট্টা দেওয়া হয়েছে। (৬) গরিব উদ্বাস্তুদের ঋণ মকুব করেছে এই সরকার। ঋণ মকুবের সার্টিফিকেট প্রদানের ফলে উদ্বাস্তুদের এখন ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার উদ্বাস্তু সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়ার বদলে মনে করে এইসব ছিন্নমূল মানুষের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের স্বার্থে আরো অনেক কিছু করণীয় আছে এবং সে কাজ তাঁরা করে যেতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮০-৮৪	১৯৮৪-৮৫
১। কলোনি প্লট উন্নয়নের সংখ্যা	২৭,৫০০ (১৯৭৭ পর্যন্ত)	৬০,৬০০ (১৯৮৩ পর্যন্ত)	– –
২। খাস জমির পাট্টা বিতরণ		৯১৮	–

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিবরণ

শ্রম

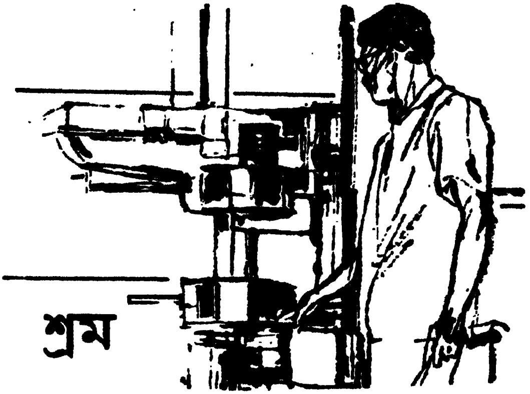

আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ধর্মঘট, লক আউট, লে অফ, ক্লোজার প্রভৃতি শিল্প সমস্যাগুলির সুষ্ঠু মীমাংসা করাই হল বর্তমান সরকারের মূল উদ্দেশ্য। ফলে এঞ্জিনিয়ারিং, বস্ত্র, চা ও পাট শিল্পের সমস্যাগুলির সুষ্ঠু মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া মূল্য বৃদ্ধির দিকে নজর রেখে শ্রমিকদের আর্থিক ও প্রকৃত মজুরি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা যাতে সমস্যা হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকেও বর্তমান সরকার নজর রেখেছে।

উল্লেখ্য, বিশেষ করে জুট মিলগুলিতে ঘন ঘন লক আউট হওয়ার ফলে গত ৭ বছরে এক বড়ো অঙ্কের শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে। ১৯৭৯ সালে ৫৩ দিনের এবং ১৯৮৪ সালে ৮৪ দিনের ধর্মঘট শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ও

দৃঢ় সংগ্রামের পরিচয় দেয়। এ প্রসঙ্গে মেটাল বক্স কর্মীদের সাহসী সংগ্রামের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭০-৭৬ এবং ১৯৭৭-৮৩ সালে ঘটিত ধর্মঘটের বিবরণ নিম্নরূপ:

	ধর্মঘটের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংখ্যা	নষ্ট শ্রম-দিবস
১৯৭০-৭৬	১,৬৮১	১৯.৬১ লক্ষ	৩.৬৫ কোটি
১৯৭৭-৮৩	৭০৬	৭.৬৪ লক্ষ	২.৫০ কোটি

তালিকায় বোঝা যাচ্ছে গত ৭ বছরে ধর্মঘটের ফলে ৭২ শতাংশ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে।

বন্ধ কলকারখানাগুলি পুনরায় চালু করা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক আউট প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকার নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে শিল্প-শ্রমিক আইন সংশোধন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালের 'ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট', ১৯৬৩'র 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সপস অ্যান্ড এস্টাব্লিসমেন্ট অ্যাক্টস' এবং ১৯৭৪ সালের 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়ার্কমেনস হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স অ্যাক্টে'র সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়া অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের চাকুরির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ১৯৮১ সালে "টিনডল মজদুর বিল" গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এটি ছাড়া

রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে "ট্রেড ইউনিয়ন বিল (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যামেণ্ডমেন্ট, ১৯৮৩)"।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে কলকারখানা বন্ধের ব্যাপারে,বর্তমান আইন অনুযায়ী, কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই। সে কারণে ১৯৪৭ সালের 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট' সংশোধনী বিলে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভবপর হবে। রাজ্যে লক আউট ও ক্লোজারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

লক আউট	ক্ষেত্রের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংখ্যা	নষ্ট শ্রম-দিবস
১৯৭০-৭৬	১,০৩২	৫.৪১ লক্ষ	২.৫৯ কোটি
১৯৭৭-৮৩	১,০৩৭	৭.৫২ লক্ষ	৬.২৮ কোটি

ক্লোজার	ক্ষেত্রের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংখ্যা	নষ্ট শ্রম-দিবস
১৯৭০-৭৬	৮৪৭	১৬৫ হাজার	—
১৯৭৭-৮৩	৪৮৩	৪৮ হাজার	—

প্রায় ৩৬টি অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ধার্য করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে কৃষি শ্রমিকরাও রয়েছেন।

রাজ্য সরকার গত ৭ বছরে 'স্টেট কন্ট্র্যাক্ট লেবার অ্যাডভাইসরি বোর্ডের' মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প ইউনিটে

কন্ট্র্যাক্ট লেবার নিয়োগ প্রথা বন্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছে। বর্তমানে এমন কোন আইন নেই যার দ্বারা কন্ট্র্যাক্ট লেবারদের স্থায়ীভাবে বহাল রাখতে বাধ্য করানো যায়।

শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য বামফ্রন্ট আমলে ই এস আই স্কিমে রাজ্যে মোট ১৯টি সার্ভিস ডিসপেনসারি স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি ওষুধের দোকান খোলা হয়েছে ১৬টি। ই এস আই হাসপাতালের সংখ্যা ৯ থেকে বেড়ে ১২য় দাঁড়িয়েছে। শয্যাসংখ্যা ২ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছে ৩,১৫৫। ঠাকুর পুকুরে আর একটি ই এস আই হাসপাতাল নির্মাণের কাজ চলছে। সল্ট লেকে একটি রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ১৯৭৭ সালে সদস্য সংখ্যা যেখানে ছিল ১০.৬০ লক্ষ সেখানে ১৯৮২-তে হয়েছে ১৬.৩৮ লক্ষ। চাকুরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দানের জন্য ১৭.১০.৭৭ থেকে রাজ্য সরকার এই প্রথম সমস্ত সরকারি ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে কর্ম নিয়োগকেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়োগ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। উল্লেখ্য, গত ৭ বছরে কর্ম নিয়োগকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৮৫ হাজার জন চাকরি পেয়েছেন। ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বেকার ভাতা চালু করা হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৬ লক্ষ বেকার এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন।

ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা, একমাত্র

কর্মনিয়োগ সংস্থার মাধ্যমেই চাকরি, শ্রমিকদের পক্ষে ও তাঁদের সহযোগিতায় সরকার পরিচালনার নজির বামফ্রন্ট শাসনের আগে কখনই ছিল না, এখনও কোথাও নেই।

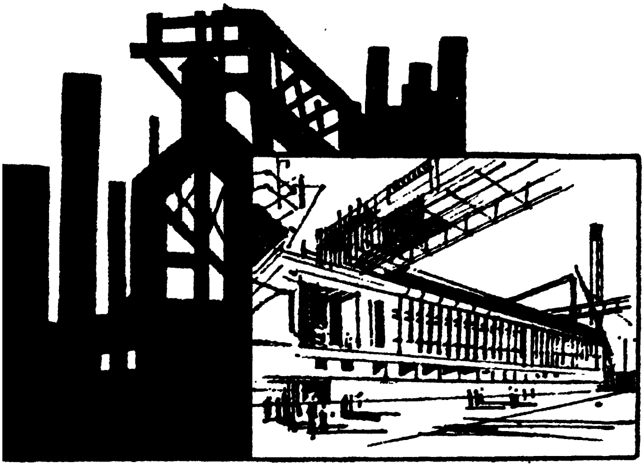

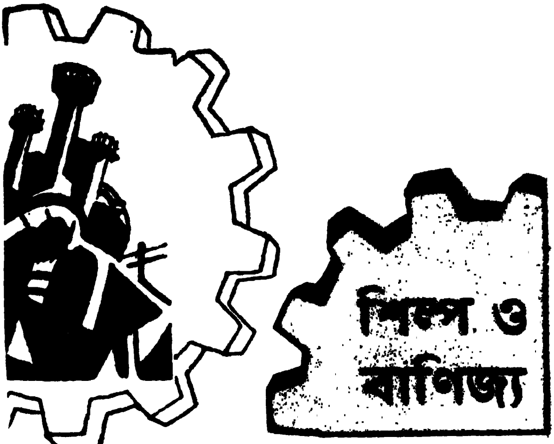

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলা শিল্পক্ষেত্রে ভারতের অগ্রবর্তী রাজ্য ছিল। নিকটবর্তী খনি অঞ্চল, দক্ষ শ্রমিক, উন্নত বন্দর, কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতা, ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে এটা সম্ভব হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কেন্দ্রের অবিচার-মূলক ও অদূরদর্শী নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানগত এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা ক্রমেই হ্রাস পেতে লাগল। পঞ্চাশের দশকে পূর্বাঞ্চলের কয়লা, লোহা, ইস্পাত ইত্যাদির দাম সারা ভারতে এক করে দেওয়া হল। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে সহজলভ্য (যেমন তুলা ইত্যাদি) যে সব কাঁচামাল অন্যান্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের জন্য আসে, সেসব

সামিগ্রীর দাম সারা ভারতে এক করা হল না। ফলে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে যেতে লাগল। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোৎপাদন অর্ধেক হয়ে যায়। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে একদিকে যেমন কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল, অন্যদিকে তেমনি নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের কাজও শুরু হল। উৎপাদনও বাড়ে। নিচে প্রদত্ত তালিকা থেকেই এটি সুস্পষ্ট হবে:-

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮২
রেজিস্ট্রিকৃত চালু কারখানার সংখ্যা	৫,৮৩৭	৬,৯৫৪
শিল্পে উৎপাদনবৃদ্ধি (১৯৭০-১০০ ধরে)	১০৮.৮	১২২.২

কেন্দ্রের বঞ্চনার আর একটি নিদর্শন হিসাবে বলা যায় যে গত সাত বছরে বামফ্রন্ট সরকার ২,১৪৫ শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্র অনুমোদন করেছে মাত্র ৭৬৩টি প্রকল্প। উল্লেখ্য, হলদিয়া পেট্রো-রসায়ন প্রকল্প ও জাহাজ মেরামতি কারখানা রূপায়ণের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের কাছে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায়নি।

লবণ হ্রদে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স স্থাপনের প্রস্তাবও কেন্দ্র অনুমোদন করেনি। রাজ্য সরকার এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প রূপায়ণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম এ রাজ্যে সুনির্দিষ্ট শিল্পনীতি ঘোষণা করে। এর আগে কোন সুস্পষ্ট নীতিই ছিল না। রাজ্য সরকার রাজ্যের অনুন্নত এলাকায় ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, ঐ একই সুবিধা পাওয়া যাবে রাজ্যের যে কোন অঞ্চলে ইলেকট্রনিক্স এবং ঔষধ শিল্পের ক্ষেত্রেও।

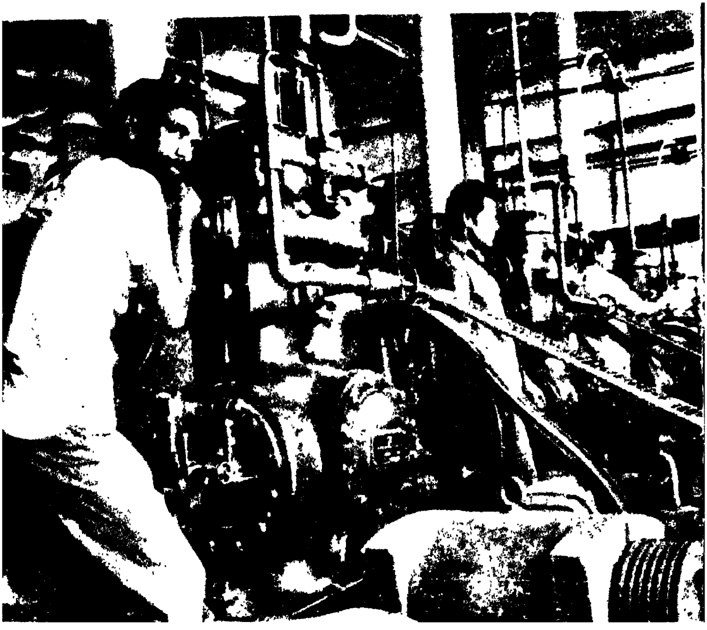

বৃহত্তর কলকাতার পরিবর্তে রাজ্যের অনগ্রসর এলাকাগুলিতে যাতে দ্রুত শিল্প গড়ে ওঠে সেজন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, ফরাক্কা, বাঁকুড়া, মালদহ, দার্জিলিং-এ বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করে এইসব জায়গাকে শিল্প স্থাপনের উপযোগী করে তুলেছে। এজন্য ইতিমধ্যে দু কোটি টাকার উপর খরচ হয়েছে। এছাড়া কল্যাণী ও হলদিয়ায় ৭১০ একর জমি অধিগ্রহণ করে শিল্প স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যেই ৫২টি ইউনিটকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। ৩২টিতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে। কাজ পেয়েছে ৪,৫০০ জন। একটি মনিটরিং ইউনিট অনুমোদিত প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে বাধাগুলি দূর করার জন্য সর্বদাই সহযোগিতার হাত এগিয়ে দিচ্ছে।

গত সাত বছরে রাজ্য স্তরে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম ১৩৬টি শিল্পকে নানা ভাবে সাহায্য করায় ১৪,৯৯১ জনের চাকুরি হয়েছে। এই সময়ে উক্ত নিগম যৌথ উদ্যোগে ৬টি কারখানা স্থাপন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন ১৪টি ইউনিটকে ২৪ কোটি টাকা সাহায্য দিয়েছে। এতে এখনই সরাসরি ২,০০০ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। সল্ট লেকে যৌথ উদ্যোগে দুটি ইলেকট্রনিক্স কারখানা চলতি বছরেই উৎপাদন শুরু করবে। ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশনকে নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য সল্ট লেকে ৯৩ একর জমি দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান

করে সল্ট লেকে ইলেকট্রনিক্স শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিও গঠিত হয়েছে। ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড ফাইটোকেমিক্যাল ডেভেল-পমেন্ট কর্পোরেশন কল্যাণীতে বছরে ৫০ টন হাইড্রোকুইনোলিন উৎপাদনক্ষম একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এখানে ওষুধ কারখানা স্থাপনের জন্য ৫৩ একর জমি উন্নত করা হচ্ছে। এ জাতীয় কারখানা উত্তরবঙ্গে স্থাপনের চেষ্টা চলছে। মংপুতে কুইনাইন কারখানা আধুনিকীকরণের জন্য এক কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এমিটিন ও ইপিকাক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকার সচেষ্ট হয়েছে। চা উন্নয়ন কর্পোরেশন বামফ্রন্ট আমলে ছয়টি রুগ্ন চা বাগানের দায়িত্বভার নিয়েছে। গত বছর এরা ৮৪.৪৪ লক্ষ টাকার চা বিক্রি করেছে। খনিজ উন্নয়ন কর্পোরেশন উত্তরবঙ্গে দুটি খনি থেকে কয়লা তোলার জন্য অনুমতি চেয়েছে। উত্তরবঙ্গে ডলোমাইট তোলার কাজ এরা শুরু করেছে, পুরুলিয়াতে ফসফেট তোলার কাজ চলছে। এ সবই বামফ্রন্ট আমলের কাজ।

রাজ্য সরকার পরিচালনাধীন শিল্পসংস্থার মধ্যে কয়েকটিতে লাভ হচ্ছে, কয়েকটিতে লোকসান কমেছে।

২৪ পরগনা জেলার ফলতায় ২৮০ একর জমিতে 'এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন' স্থাপন করার জন্য রাজ্য সরকার এই অঞ্চলে সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নানা

পদক্ষেপ নিয়েছে। আশা করা যায় দু বছরের মধ্যে এসব কাজ শেষ হবে। ফলতার এই প্রকল্প শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়,গোটা পূর্বাঞ্চলের পক্ষে নতুন আশার আলোস্বরূপ।

৮৪৪.৪ কোটি টাকা ব্যয়ে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। রাজ্য সরকার সপ্তম পরিকল্পনার মধ্যে এর কাজ সম্পূর্ণ করতে চান। রাজ্যের শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। একটি কয়লাভিত্তিক জ্বালানি এবং রসায়ন প্রকল্পের জন্যও কেন্দ্রের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। কোল ইন্ডিয়ার ডানকুনি কারখানায় উৎপাদিত প্রতিদিন ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

শিল্প স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ, পরিবর্তিত বিদ্যুৎ পরিস্থিতি, রাজ্য সরকারের প্রয়োজনীয় সাহায্য সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পক্ষেত্রে আজ আবার অগ্রগতির পথে পা বাড়িয়েছে।

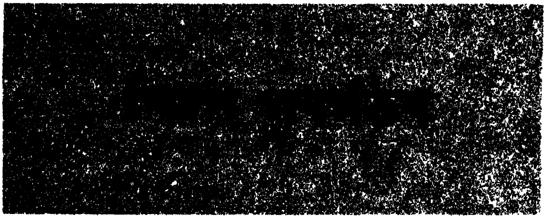

বন্ধ এবং রুগ্ন শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সাহায্য এবং সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করাই এই বিভাগের কাজ। ১৯৭৭ পর্যন্ত মোট ৬ টি শিল্প সংস্থা এই বিভাগের সুপারিশে অধিগৃহীত হয়। এছাড়া ১৯৭২-৭৭এর মধ্যে ১২টি রুগ্ন শিল্পকে বিশেষ সাহায্য দেওয়া হয়।

বামফ্রন্ট আমলে এই বিভাগের কাজকর্মকে আরও সুনিয়ন্ত্রিত করবার উদ্দেশ্যে একটি অ্যাডভাইসরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ওয়ার্কার্স কো-অপারেটিভ-এর মাধ্যমে শিল্প সংস্থা পরিচালনার ব্যাপারেও উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে রাজ্য সরকারের সুপারিশক্রমে আরো ৮টি বন্ধ রুগ্ন সংস্থাকে অধিগ্রহণ করে এই বিভাগের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এর মধ্যে কিনিসন জুট মিলস কোম্পানিটি ১৯৮০ সালে ভারত সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত করে।

এসব ছাড়া বিশেষ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দার্জিলিং-এর রোপওয়ে কোম্পানিকে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নিজের অধীনে নিয়ে এসেছে। পূর্বতন শালিমার

ওয়াকর্স কোম্পানিকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে একটি নতুন সরকারি কোম্পানি। অনুরূপভাবে লিকুইডেটেড ইন্ডিয়া পেপার পাল্প ও ন্যাশনাল পাইপস অ্যান্ড টিউবস কোম্পানি দুটি নিয়েও দুটি নতুন সরকারি কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ভারত জুট মিলসের পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে।

অধিগৃহীত শিল্প সংস্থাগুলি পরিচালনার কাজ ছাড়া গত সাত বছরে "ওয়েস্ট বেঙ্গল রিলিফ আন্ডারটে-কিংস (স্পেশাল প্রভিসনস) অ্যাক্ট" অনুযায়ী ৪২টি রুগ্ন শিল্প সংস্থাকে রাজ্য সরকার বিশেষ সাহায্য দিয়েছে। অন্যান্য ধরনের ১০টি রুগ্ন শিল্প সংস্থাকে রাজ্য সরকার গত সাত বছরে মোট ৩২০ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। গ্যারান্টার হিসেবে দাঁড়িয়ে ঋণ পেতে সাহায্য করেছে বহু রুগ্ন শিল্প সংস্থাকে।

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮৩-৮৪
১। অধিগৃহীত শিল্প সংস্থার সংখ্যা	৭	১৩
২। অধিগৃহীত শিল্প সংস্থাগুলিকে সাহায্যের পরিমাণ	৯৫৯ লক্ষ টাকা	১,৬৬৭ লক্ষ টাকা
৩। উপকৃতের সংখ্যা	৪,৩৮১ জন	৭,২৯১ জন

গ্রামীণ জল সরবরাহ

গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের অভাব দূর করতে গ্রামীণ জল সরবরাহ অধিকারের পক্ষ থেকে গত ৭ বছরে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে।

১৯৭৭ সালে এই বিভাগের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ১-৪-৭৭ পর্যন্ত রাজ্যের মোট ৩০,২৭৫টি গ্রামে পানীয় জলের উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তী ৩ বছরে পাইপ ও পাম্পচালিত টিউবওয়েল প্রভৃতির মাধ্যমে জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এই সংখ্যা নেমে ২৫,২৭৩-এ দাঁড়ায়। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত আরও ১১,২৮০টি গ্রামে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ গত সাত বছরে নতুন ১৬,২৮২টি গ্রামে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

'পানীয় জল সরবরাহ ও অনাময় দশক'-এর মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা

করতে ৬ষ্ঠ ও ৭ম পরিকল্পনা কালে আনুমানিক প্রায় ১,৩৩২ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ করার জন্য এম এন পি এবং এ আর পি কর্মসূচিতে ২০৪টি প্রকল্পে

বর্তমানে কাজ চলছে। এছাড়া রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামাঞ্চলে ন্যূনতম প্রয়োজনভিত্তিক কর্মসূচিতে প্রতি বছর ৩ হাজারটি জলের উৎস সৃষ্টি করার জন্য ব্যয় মঞ্জুর করা হয়েছে।

রুক্ষ ও পাথুরে অঞ্চলে বছরে ৩ হাজারটি করে 'রিগ বোর্ড টিউবওয়েল' বসানোর কাজও চলছে।

'৭৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে মোট চালু টিউবওয়েল ও কূপের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৯,১২৭ ও ২৩,৯০৩। ১৯৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত শুধু ন্যূনতম প্রয়োজন ভিত্তিক কর্মসূচি প্রকল্পেই ২৩,৭৪১টি জলের উৎস খননের অনুমোদন পাওয়া গেছে। '৭৭-৭৮ থেকে '৮২-৮৩ পর্যন্ত এ আর ডবলিউ এস পি প্রকল্পে মোট ১৪,২৩৯টি রিগ বোর্ড টিউবওয়েল বসানো হয়েছে।

শহরে জল সরবরাহ

স্বাধীনতার সময় ১৯৪৭ সালে রাজ্যে মাত্র ২৭টি পৌর সভায় নলের সাহায্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ১,১০৫.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮২ টি প্রকল্পের মাধ্যমে পৌর সভাগুলিতে পাইপের সাহায্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার শুরুতে রাজ্যের ১৩টি পৌর সভায় নলের সাহায্যে জল সরবরাহের কোন রকম ব্যবস্থা ছিল না। বিভিন্ন পৌর সভা অঞ্চলে তখন ২৪টি জলসরবরাহ প্রকল্পের কাজ চলছিল। এগুলির মধ্যে আরামবাগ, কৃষ্ণনগর, বীরনগর, চাকদা, রামপুরহাট ও খড়গপুর পৌর সভার অধীনে দুটি প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এছাড়া এই সময়ের মধ্যে গড়বেতা ও বেলডাঙায় দুটি জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজও সম্পূর্ণ হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় নগর অঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য দুটি নতুন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া

জল সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্যও দুটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে নগর অঞ্চলে জল সরবরাহ খাতে মোট ৪২.৩৫ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম তিন বছরে মোট ১০.৬৫ কোটি টাকা খরচ করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে এল আই সি লোন প্রোগ্রামের সাহায্যে ৭টি সমেত মোট ৩২টি নগর জলসরবরাহ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। আশা করা হচ্ছে, এই দশকের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি পৌর সভাতেই পাইপের সাহায্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

তফসিলী ও আদিবাসী কল্যাণ

এরাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশই তফসিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায়

আসার পর থেকে বামফ্রন্ট সরকার এইসব পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়গুলির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। একটি তুলনামূলক হিসাব নিচে দেওয়া হল:

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮৪-৮৫
১। আর্থিক ব্যয়-বরাদ্দ	৫৮৮ লক্ষ টাকা	৪,৩৯২.১৯ লক্ষ টাকা
২। শিক্ষা বৃত্তি-প্রাপ্ত তফসিলী ও আদিবাসী ছাত্রের সংখ্যা	১,৮৪,১০৬	৩,৮৭,০০০ (৮৩-৮৪)
৩। ছাত্রাবাস, আশ্রম ছাত্রাবাস ইত্যাদি স্থাপনের সংখ্যা	৩২২টি	৪৭৩টি
৪। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র সংখ্যা	২,৪৭,৬৪২ জন	৪,৮৭,০০৫ জন
৫। মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	১১,৬০০ জন	৫০,০০০ জন

যেহেতু তফসিলী জাতি ও আদিবাসীদের সিংহভাগই কৃষির উপর নির্ভরশীল সে-কারণে বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোতে যতটা সম্ভব রাজ্যের সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন করে এই শ্রেণীর অনুকূলে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি-সংস্কার কর্মসূচিতে মোট ১৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩ শত ২৯ জন জমির পাট্টাপ্রাপকের মধ্যে ৫,৪৭,১২০ জন তফসিলী জাতি এবং ২,৮৪,২২৫ জন আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত, নথিভুক্ত বর্গাদারদের ৬০ শতাংশই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রান্তিক চাষীদের মহাজনদের কবল থেকে মুক্ত করতে চাষের কাজে আর্থিক সাহায্য প্রদান কর্মসূচিতে ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ২,৩১,৬২৮ জন ব্যক্তিকে মোট ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ঋণ ও সাহায্য হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পরিপূরক পরিকল্পনায় তফসিলী জাতি ও আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য কৃষি, কুটির শিল্প, সেচ, মৎস্য চাষ, পশুপালন, সমবায়, বন উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এপর্যন্ত ৪০ শতাংশ আদিবাসীকে এই পরিকল্পনার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

তফসিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের মাধ্যমে এই শ্রেণীর যুবকদের নানা কাজে মধ্য মেয়াদী

ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। এই নিগমের সাহায্যে ১৯৮৪-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৪৩,০৯৭ জনকে মোট ১০০,১৫,৯৪,৮৭০ টাকার আর্থিক সাহায্যের সংস্থান করে দিয়েছেন।

৬৮টি বহুমুখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম লিমিটেড তাদের ন্যায্য মূল্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ কর্মসূচিতে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে *গত আর্থিক বছরে ২,৩৬,০০,০০০ টাকা মূল্যের ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করেছেন। সরকারের নতুন বন* নীতিতে ক্ষুদ্র ও বনজ সামগ্রীগুলির বিপণনে একচেটিয়া অধিকার এই সমবায় সমিতিগুলির উপর ন্যস্ত হয়েছে। ফলে আদিবাসীদের মধ্যে গত বছর ১০.৭৫ লক্ষেরও বেশি শ্রমদিবস সৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া তাদের ন্যায্য মূল্যে আলু, রুটি ও বিস্কুট সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অরণ্যের অধিকার আদিবাসীদের ফিরিয়ে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার বহুকালের দাবিকে মর্যাদা দিয়েছে।

তফসিলী জাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে শিক্ষা প্রসারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে শিশুদের জন্য শিক্ষার সঙ্গে খাদ্যের সংস্থান করা হয়েছে। তাছাড়া বামফ্রন্ট আমলে বিভিন্ন ছাত্রাবাসে থাকার জন্য বৃত্তির হার ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫ টাকা করা হয়েছে। বই কেনার জন্য দেয়

টাকার পরিমাণও প্রত্যেক শ্রেণীতেই পূর্বের দ্বিগুণ বা তার বেশি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে প্রায় ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী হোস্টেল খরচ পাচ্ছে। দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পরিবারকে ভরণ-পোষণ ভাতা দেওয়ার ফলে বর্তমানে ২৯,০০০ আদিবাসী ছাত্রছাত্রী উপকৃত হচ্ছে।

আদিবাসীরা যাতে নিজেদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নিজেদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটাতে পারেন তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। গড়ে উঠেছে উপ-জাতি সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র। অলচিকি হরফের স্বীকৃতি দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার সাঁওতাল ভাষাভাষী আদিবাসী ছেলেমেয়েরা যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে পারে সেজন্য তাদের অলচিকি হরফের বইও দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। বামফ্রন্ট সরকারের রূপায়িত কর্মসূচির নিট ফল এই অনগ্রসর শ্রেণীর লোকেরা আজ তাঁদের দাবি সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন এবং দাবি আদায়ের জন্য সংঘবন্ধ হতে শিখেছেন।

সুন্দরবন উন্নয়ন

সমুদ্রতীরবর্তী সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে অনুন্নত এলাকা। ৯,৬৩০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এই এলাকায় ২৬ লক্ষ লোকের বাস হলেও এখানকার জল লবণাক্ত, সেচ ও পানের অযোগ্য। রাস্তাঘাট, রেল লাইন নামমাত্র, বিদ্যুৎ আছে সামান্য এলাকায়। জলে কুমীর, জঙ্গলে বাঘ এবং লোকালয়ে জমিদার মহাজনের থাবা সামলে এখানকার মানুষ কোনক্রমে প্রাণধারণ করেন। এলাকার মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করেন, বিরাট সংখ্যক মানুষ তফসিলী জাতিভুক্ত, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর।

১৮৭২-৭৩ সালে বহু ঢাক ঢোল পিটিয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হলেও তৎকালীন ২১ লক্ষ মানুষের জন্য বার্ষিক বরাদ্দ ছিল ১ লক্ষ টাকা। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ায় সেই বরাদ্দ বেড়ে হয় ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এখনকার বার্ষিক বরাদ্দ হল প্রায় ৪ কোটি টাকা।

বামফ্রন্ট সরকার সুন্দরবন উন্নয়নের যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, তা হল—পরিবহণের উন্নতি, সেচ ও জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি, এক ফসলী জমিকে দুই ফসলী জমিতে রূপান্তর, উৎপাদিত পণ্যের বাজার তৈরি, পণ্য সুরক্ষার জন্য গুদাম নির্মাণ, এসিয়ার বৃহত্তম খামার নির্মাণ, বনসম্পদ রক্ষা, ফলের চাষ বৃদ্ধি, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উৎসাহ দান, হাঁস, মুরগী, শূকর পালনে সাহায্য দান। বয়স্কদের সাক্ষর করে তোলার ব্যাপক কর্মসূচিও নিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ২৭টি বিকাশ কেন্দ্র মারফত এক ফসলী জমি দু ফসলীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তিন লক্ষ আটশ' নয় জন কৃষক এতে উপকৃত হয়েছেন। সরকার অনুদান দিয়েছে ২ কোটি ৬৮ লক্ষ ৪ হাজার ৫৩৬ টাকা। এর ফলে বাড়তি ফসল উৎপন্ন হয়েছে ১২ কোটি টাকা মূল্যের। ১০ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ব্যয়ে ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৩২ জন ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীকে নারকেল চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে গত চার বছরে। গত সাত বছরে সুন্দরবন এলাকায় ১০০ কি. মি. পাকা রাস্তা, ৭৪টি মজা খাল ও পুকুরের সংস্কার, ৫৬টি কাঠের সেতু, ৩৪টি কাঠের জেটি, ২টি পাকা জেটি, ৫টি যাত্রী শেড, ১৫০টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৫৫টি স্লুইস সংস্কার, ১০টি ক্রশ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। ক্যানিং ও জয়নগরের নিমপীঠ বাজার উন্নয়নের জন্য অর্থ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, ১৯৮১ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় একটি পাঁচশালা উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনাতে ৩১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকা রাস্তা নির্মাণ; বাঁধ তৈরি, জলনিকাশি ব্যবস্থা, জেটি নির্মাণ, খাল ও পুকুর সংস্কার, ২ হাজার কিলোমিটার এলাকায় বনসৃজন, বিনামূল্যে ব্যাপক চারাগাছ বিতরণ, মৎস্য খামার নির্মাণ, বরফ কল প্রতিষ্ঠা, পুকুর তৈরি প্রভৃতির কাজ রূপায়িত হচ্ছে।

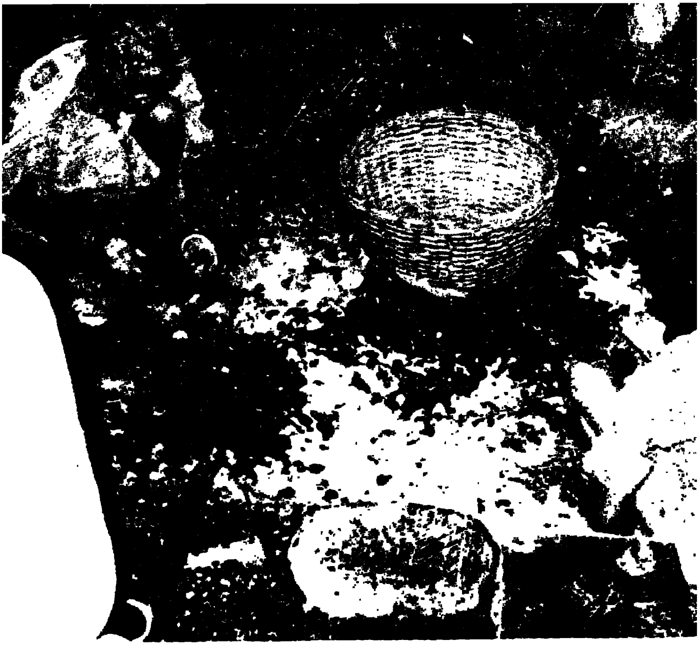

ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন

পশ্চাৎপদ বলে চিহ্নিত মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হয়। এই মহকুমার মোট জনসংখ্যার ২৯.৪% আদিবাসী ও ১২.৬% তফসিলী জাতিভুক্ত।

গত ৭ বছরে ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্ষদের কাজের আর্থিক ব্যয়বরাদ্দের বিবরণ নিম্নরূপ (টাকার অঙ্কে):

	১৯৭৭-৭৮	১৯৮৩-৮৪
১। মোট আর্থিক বরাদ্দ	৩৫,০০,০০০	৫০,০০,০০০
(ক) সেচ	১৩,০০,০০০	২০,১৫,৬১৬
(খ) শিক্ষা	৩,৯৮,৭০৮	—
(গ) রাস্তাঘাট	১৩,৮৮,৫৩৩	২০,৩৪,৮৩৪
(ঘ) ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প	৮৭,০০০	১০,০০০
(ঙ) বন	৯২,৫০০	—

সেচ : ১৯৭১ থেকে ১৯৮৪'র প্রথম কয়েক মাস পর্যন্ত মোট ৪২টি নদী জল উত্তোলন সেচ প্রকল্প এবং ২১২টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প রূপায়িত হয়। এছাড়া কাথুয়া খাল ও মুরলী খাল 'প্রকল্পের মাধ্যমেও সেচের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে।

রাস্তাঘাট : গত সাত বছরে সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ১৫১টি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। এসব কাজে পঞ্চায়েত ও পুরসভা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। এছাড়া অনেকগুলি কালভার্ট ও সেতু নির্মিত হয়েছে।

শিক্ষা : গত সাত বছরে ঝাড়গ্রাম মহকুমায় প্রাথমিক, উচ্চ ও মহাবিদ্যালয়ের ১৬৫টি গৃহনির্মাণ ও সংস্কারের কাজ শেষ করা গেছে। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও গবেষণাগার নির্মাণের ক্ষেত্রেও পর্ষদ পিছিয়ে নেই।

বনসৃজন : বনসৃজন কর্মসূচিতে ১৯৭৭-৭৮ সালে ৪টি প্রকল্প, ১৯৭৯-৮০ সালে ৪টি প্রকল্প এবং ১৯৮০-৮১ সালে ৫টি প্রকল্পের উল্লেখ করা যায়। এছাড়া ১৯৮১-৮২ সালে বন বিভাগকে ২০০ হেক্টেয়ার জমিতে বনসৃজন ও নার্শারি তৈরির জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়।

এছাড়া পশুপালন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, পানীয় জল সরবরাহ, চিকিৎসা সহায়ক কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও এই পর্ষদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন

দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতি বামফ্রন্ট সরকার প্রথম থেকেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৩-৮৪ পর্যন্ত পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচিতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে উচ্চফলনশীল ও উচ্চ মূল্যের শস্যাদি ফলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ৫,৫০০ একর জমিতে এই ধরনের শস্যের চাষ হয়েছে। ১৮,০০০ একর জমিতে উচ্চফলনশীল ভুট্টার চাষ হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে দার্জিলিং জেলায় কমলালেবুর চাষ হয় ২,২৫২ একর জমিতে। এখন তা বেড়ে ৩,৯৭২ একর হয়েছে।

পার্বত্য এলাকায় ফলের চাষ বৃদ্ধি প্রকল্পে ১৯৭৭-৭৮ সালে বরাদ্দ ছিল ৩৬·৬২ লক্ষ টাকা। ১৯৮২-৮৩ সালে বরাদ্দের পরিমাণ হয়

পা৮৩. এলাকা উন্নয়নসূচিতে কালিম্পং-এর নবরূপায়ণ

৪৩'২৬ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া দার্জিলিংএর ফল ও সবজি প্রক্রিয়াকরণ সমবায় সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৩-৮৪ পর্যন্ত ৭১'৭২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পার্বত্য এলাকার বনমৃত্তিকা সংরক্ষণ বিভাগ ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত ৯৭টি প্রকল্প চালু করে ১,৭৮৬ হেক্টেয়ার ভূমির সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত ১৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৭টি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ। সেচ ও জলপথ বিভাগ পরিচালিত ১৪টি প্রকল্পের কাজও সম্পূর্ণ। ৫৬টি প্রকল্প কার্যকর করায় ১,৩৫০ একর কৃষি জমিতে ক্ষয় রোধ করা গেছে।

এই এলাকায় ১৯৮০-৮৪ পর্যন্ত ৭২৫ একর জমি সেচের আওতায় এসেছে। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকগণের উদ্যোগে ১,২৪৮'৩৬ একর জমি সেচের আওতায় এসেছে। ব্যাপক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০ একর জমিকে আওতাভুক্ত করে ৪টি ক্ষুদ্র প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে। জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন এজেন্সির সহায়তায় ৪০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী সেচের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। ১৯৭৭-৮৪ পর্যন্ত এ বাবদ ২২১'২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পার্বত্য এলাকায় পশু পালনের জন্য ৪টি কৃত্রিম প্রজণন কেন্দ্র ও ৩২টি উপকেন্দ্র স্থাপনের কাজ ১৯৮৪ সালে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি পার্বত্য ব্লকে ১টি করে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ছাড়াও দার্জিলিং এ পশু চিকিৎসা হাসপাতাল নির্মাণ ও কার্শিয়াঙে জলাতঙ্ক প্রতিষেধক টীকা গবেষণাগার সম্প্রসারিত হচ্ছে। হাঁস-মুরগী পালন সম্প্রসারণ প্রকল্পে ১৯৮০-৮৪ পর্যন্ত ২১১'৫৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

বছরে ১৭০ হেক্টেয়ার হারে ১৯৮০-৮৪ পর্যন্ত এই এলাকায় ৩,৭০০ হেক্টেয়ার বনায়ন সম্ভব হয়েছে। হিমালয় অঞ্চলের বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য দার্জিলিং পদ্মজা নাইডু জুলজিক্যাল পার্ককে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে এ বাবদ বরাদ্দ ছিল ৬৯'৫৫ লক্ষ টাকা।

১৯৭৪-৮০ এবং ১৯৮০-৮১ থেকে '৮৩-৮৪ পর্যন্ত দার্জিলিং জেলার ২,১৭৩ একর এবং অতিরিক্ত ৭৬৬ একর জমি সিঙ্কোনা চাষের আওতায় আনা হয়েছে। ১৯৭৭-৮৪ পর্যন্ত এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮০'৮২ লক্ষ টাকা।

১৯৮০ থেকে '৮৪ পর্যন্ত পার্বত্য এলাকায় জনস্বাস্থ্য এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে ৬৬টি জল সরবরাহ প্রকল্প কার্যকর হয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ১৯৮০-৮৪ সাল পর্যন্ত ৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের সংস্কার ও সম্প্রসারণ হয়েছে এবং গ্রামীণ এলাকায় ৫২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন খেলার মাঠ নির্মিত হয়েছে। কালিম্পঙে কলেজ ভবন নির্মাণের জন্য ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দার্জিলিং সদর হাসপাতালে ১০০টি শয্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পশুপালন ও পশুচিকিৎসা

গ্রামীণ অর্থনীতিতে পশুপালনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পশুপালনের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সুষম খাদ্য, দুধ, ডিম, মাংস ইত্যাদির উৎপাদন হবে, অন্যদিকে গ্রামের বেকার, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, তফসিলী চাষী ও আদিবাসীরা অতিরিক্ত কর্ম সংস্থানের সুযোগ পাবেন। বামফ্রন্ট সরকার এ বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। গত ৭ বছরে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ থেকেই এই গুরুত্বের কথা খানিকটা বোঝা যাবে।

পশুপালনের ক্ষেত্রে একটি তুলনামূলক তালিকা পেশ করা হল :

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮৪-৮৫
১। বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ	৩২,৬২,৬২,০০০টা.	৫১,৭০,৭৫,০০০টা.
২। নিবিড় গো উন্নয়ন প্রকল্প	৪টি	৮টি
৩। কেন্দ্রীয় গো-বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	২২টি	৩৯টি
৪। গো-প্রজণন কেন্দ্র	৯৩টি	১৩১টি
৫। ঐ উপকেন্দ্র	৮১৪টি	১,২১২টি
৬। পশুখাদ্য উৎপাদন কারখানা	২টি	৪টি
৭। পশুখাদ্য উৎপাদন	১০,৬০০ মে. টন	২৫,০০০ মে. টন
৮। ডিমের উৎপাদন	১০.৫ লক্ষ	৬৭.৬ লক্ষ
৯। দুগ্ধ উৎপাদন	১০,৬৪,০০০ মে. টন	২১,০০,০০০ মে. টন
১০। দোহ্‌শালা	৪টি	৬টি.

দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি লক্ষ রেখে বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ প্রকল্প মারফত এ পর্যন্ত ২২,১৪৪টি পরিবারকে বিনামূল্যে শূকর, হাঁস, মুরগী বিতরণ করে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করেছে।

পশু চিকিৎসার ক্ষেত্রেও বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। নিচে একটি তালিকা দেওয়া হল:

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮৩-৮৪
১। পশু হাসপাতাল	৭৬	১০৩
২। পশু ডিসপেন্সারি	৩৩৫	৫৪১
৩। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র	৩০	৮৩
৪। প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি	২৪	৩৫
৫। চিকিৎসা সহায়ক কেন্দ্র	৫২০	৫২৮
৬। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র	০	৩

শহর ও শিল্পাঞ্চলে ন্যায্য মূল্যে স্বাস্থ্যকর দুধ সরবরাহের জন্য দুগ্ধ উন্নয়ন কর্মসূচি চালু রয়েছে। রাজ্যে এখন হরিণঘাটা ও বেলগাছিয়া, দুর্গাপুর, মাটিগাড়া (শিলিগুড়ি), বর্ধমান ও ডানকুনিতে ৬টি দোহ্‌শালা চালু রয়েছে। কৃষ্ণনগরে আর একটি ডেয়ারি স্থাপনের কাজ সমাপ্তির পথে। সরকারি ডেয়ারি মারফত ১৯৭৭ সালে যেখানে পাওয়া যেত ২.২৬ লক্ষ

লিটার দুধ, সেখানে এখন পাওয়া যায় ৪.৫৯ লক্ষ লিটার দুধ। এই বৃদ্ধির হার একশ ভাগের বেশি। সমবায় সমিতিগুলিকে সংঘবদ্ধ করে সমবায় ভিত্তিতে গো-উন্নয়ন, দুগ্ধ উৎপাদন এবং বিপণনের কাজ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে একটি দুগ্ধ ফেডারেশনও গঠন করা হয়েছে। শামিলটোন কারখানা মারফত প্রতিদিন এক হাজার লিটার পুষ্টিকর দুগ্ধজাত পানীয় বিক্রয় করা হচ্ছে।

স্বল্প সঞ্চয়

এ রাজ্যের উন্নয়নে স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে স্বল্প সঞ্চয়ের নিট সংগ্রহ এই রাজ্য সরকার ঋণ হিসাবে পেয়ে থাকেন। এ রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্য বিত্ত সংস্থানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সম্পদের একটা বড় অংশ উক্ত ঋণ থেকে সংগৃহীত হয়। সুতরাং সঞ্চয় সংগ্রহের ব্যাপারে রাজ্য সরকার সক্রিয়ভাবে আগ্রহী।

পশ্চিমবঙ্গে সঞ্চয় সংগ্রহের ব্যাপারটা ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। নিম্নে প্রদত্ত নিট সংগ্রহের সালওয়াড়ি হিসাব থেকেই এটা বোঝা যায়:

বছর		নিট সংগ্রহ (কোটি টাকা)
১৯৭৭-৭৮	...	৭৫.০৩
১৯৭৮-৭৯	...	১১৪.০০
১৯৭৯-৮০	...	১৫৪.৪৬
১৯৮০-৮১	...	১৭৫.৩২
১৯৮১-৮২	...	২৩০.৬৩
১৯৮২-৮৩	...	২৬৪.২১
১৯৮৩-৮৪		৩১০.০০

কয়েক বছর ধরে অনেক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কোম্পানি প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি আমানতকারীদের বঞ্চিত করে আসছিল। কোন কোন কোম্পানি আমানতের টাকা ফেরত না দিয়েই কোম্পানির দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। রাজ্য সরকার প্রচার অভিযান চালিয়ে এসব কোম্পানিতে টাকা জমা রাখা কেন অনুচিত, সে বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করে তুলেছে এবং তার ফলে এই সমস্ত সন্দেহজনক কোম্পানির কার্যকলাপ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এই জাতীয় সন্দেহজনক বেসরকারি সংস্থায় টাকা না রেখে জনসাধারণ এখন তাঁদের টাকা পয়সা পোস্ট অফিসে স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পে জমা রাখছেন।

স্বল্প সঞ্চয় বাবত অর্থ সংগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্য সরকারের স্বল্প সঞ্চয়ের সংগ্রহের জন্য ঋণ প্রাপ্তির পরিমাণও আনুপাতিক ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে স্বল্প সঞ্চয়ের সংগ্রহ বাবত যেখানে ঋণ পাওয়া গিয়েছিল ৩৮.১৩ কোটি টাকা, সেই ঋণের টাকার পরিমাণও ক্রমাগত বেড়ে ১৯৭৮-৭৯, ১৯৭৯-৮০, ১৯৮০-৮১ ও ১৯৮১-৮২ সালে হয়েছে যথাক্রমে ৬৭.৯৫ কোটি টাকা, ৯১.১১ কোটি টাকা, ১১১.৫৩ কোটি টাকা, ১৪৪.৫৩ কোটি টাকা এবং ২০১.৫১ কোটি টাকা। ৮৩-৮৪ সালে ২১৩.২৮ কোটি টাকা।

শিক্ষা

সার্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক ও বাস্তবমুখী শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ না করে দেশের সার্বিক উন্নতিসাধন, এমনকি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করা কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। তাই, বিভিন্ন প্রকার সীমাবদ্ধতার নিগড়ে বাঁধা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার সঠিক গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করে বিগত সাত বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শিক্ষাকে সকলের জন্য সহজপ্রাপ্য এবং জীবনমুখী করাই বামফ্রণ্ট সরকারের কর্মসূচি। এই কর্মসূচি রূপায়ণে গত সাত বছর অনলস প্রয়াস চালিয়েছে বর্তমান সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতে শিক্ষাখাতে ব্যয় করে ৪১৭ কোটি টাকা (১৯৮৪-৮৫) আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যয় করে ৪৫৮ কোটি ৬৫ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। এই টাকা মোট বাজেটের প্রায় ২৬ শতাংশ। পক্ষান্তরে, কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয়

করে মাত্র ০.৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় বাজেটে মাথাপিছু শিক্ষা বাবদ বার্ষিক বরাদ্দ যেখানে ৫ টাকা সেখানে পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ মাথাপিছু ৮৩ টাকা। শিক্ষাক্ষেত্রে ৭২-৭৭ সালের নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে এবং গণ-টোকাটুকি বন্ধ করে শিক্ষা-প্রাঙ্গণ কলুষমুক্ত করে সুস্থ অবস্থা ফিরিয়ে এনেছে বামফ্রন্ট সরকার।

গত সাত বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের একটি খতিয়ান নিচে পেশ করা হল:

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮৩-৮৪
আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ –	১২২ কোটি টাকা	৪,৫৮,৬৫,৬৯,০০০ টাকা (১৯৮৪-৮৫)
শিক্ষিতের হার –	৩৩.০৫ (৭১)	৪০.৮৮ (৮১)
বিদ্যালয় :		
প্রাথমিক –	৪০,৯৪২	৫০,০৯০
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক –	৮,৪৯৮	১০,১৯০
মহাবিদ্যালয় –	২৩৩	২৫২
বিশ্ববিদ্যালয় –	৭	৮
ছাত্রছাত্রী :		
প্রাথমিক –	৫৯ লক্ষ	৭৬ লক্ষ ৫৭ হাজার
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক –	মাঃ ১৮ লক্ষ উঃ মাঃ ১.৪৫ লক্ষ	মাঃ ৩২ লক্ষ উঃ মাঃ ৩.১২ লক্ষ
গ্রন্থাগারের সংখ্যা –	৭৬২	২,৪২০

প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার উদ্দেশ্য সামনে রেখে বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। চলতি বছরে ৬-১১ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের শতকরা ৯৪ ভাগ বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পাবে। ১৯৮৭-৮৮ সালের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগই এই সুযোগ পাবে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পঞ্চম শ্রেণীর স্থলে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। ভারতের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই বিতরণের ব্যবস্থা করেছে। শুধু বাংলা নয়, নেপালী, হিন্দী, উর্দু, ইংরেজী ও অলচিকি হরফে সাঁওতালী ভাষাতেও পাঠ্যপুস্তক মুদ্রিত হচ্ছে। শিক্ষাপ্রসারের স্বার্থে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাকেই একমাত্র পাঠ্য ভাষা রূপে গ্রহণ করার নীতি বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে রূপায়িত করছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও কিছু বই বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত তফসিলী ও আদিবাসী সমস্ত ছাত্রীকে বিনামূল্যে পোশাক দেওয়া হয়। এ বছর সাধারণ ঘরের গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র ছাত্রীদেরও শতকরা ৪০ ভাগকে পোশাক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রাম ও শহরের ৩৫ লক্ষ ৭১ হাজার ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে মধ্যাহ্নকালীন আহার দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের তফসিলী

ও আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যের আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে সমাজের দুর্বলতর অংশের অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ হচ্ছে। এ রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব সংস্কার করে তাকে অর্থবহ করে তোলা হয়েছে বামফ্রন্ট আমলে। সরকারের ৩৪ দফা কর্মসূচির অন্যতম বয়স্কশিক্ষা প্রকল্পে এ পর্যন্ত ২২ হাজার শিক্ষাকেন্দ্রে ৬ লক্ষেরও বেশি ব্যক্তি শিক্ষা পেয়েছেন। প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা প্রকল্পে বর্তমানে ১৬ হাজার কেন্দ্রের মাধ্যমে শহর ও গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় ৮৪-৮৫ সালে সুযোগ পাবে সাড়ে চার লক্ষ শিক্ষার্থী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করার পরেও শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং মানসিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অসাধারণ। এই দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৯ সালে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করে। বামফ্রন্ট আমলে ৮৩টি নগর গ্রন্থাগার এবং ১,৫৭৫টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার তৈরি হয়েছে। ৮৩৭টি গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগ খোলা হয়েছে। গ্রন্থমেলায় সাহায্য দিচ্ছে সরকার। এরকম আরো বহু পদক্ষেপের ফলে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন নতুন প্রাণ পেয়েছে।

শিক্ষকেরাই জাতির মেরুদণ্ড বলে অতীতে অনেক প্রচার হলেও এঁরা ছিলেন অবহেলিত। বামফ্রন্ট আমলে

এঁদের শুধু সম্মানজনক বেতন বৃদ্ধিই ঘটেনি, এঁরা মর্যাদাও পেয়েছেন; নিয়োগের ক্ষেত্রেও সুষ্ঠু নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নিয়মিত-ভাবে বেতন দেওয়ার সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

এই সরকারের আমলে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ছাড়াও একটি 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আলিপুরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবনের জন্য এক কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। কলেজ শিক্ষকদের সুষ্ঠু নিয়োগপদ্ধতি প্রবর্তন ও মাস পয়লা বেতনের ব্যবস্থা হয়েছে এবং সর্বোপরি শিক্ষার সর্ব স্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে নেতাজী এসীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্র পুরস্কার ছাড়াও বঙ্কিম ও বিদ্যাসাগর পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের নামাঙ্কিত আর একটি পুরস্কার প্রদানের বিষয়টিও সরকারের বিবেচনাধীন।

রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ বামফ্রন্ট সরকারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশ্বভারতীর বাধা অপসারিত হলে আরও বেশি সংখ্যায় তা জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হত।

সমাজ কল্যাণ

যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় বেশির ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করেন সেখানে কল্যাণমূলক কাজের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ১৯৭৭ পর্যন্ত কয়েকটি সরকারি আবাস পরিচালনার মধ্যে এই বিভাগের কাজকর্ম ছিল সীমাবদ্ধ। বামফ্রন্ট শাসন-ভার গ্রহণ করে এই বিভাগের কাজকে বহুমুখী করে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাবার জন্য গত সাত বছরে আরো ব্যাপক ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

গত সাত বছরে দশ লক্ষেরও বেশি শিশুকে সার্বিক শিশু বিকাশ প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। দুই লক্ষের অধিক মহিলাকে কর্মমুখী শিক্ষা ও আংশিক অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে।

১৯৭৮-এর বন্যার পর দশটি জেলার ত্রিশটি ব্লকে যে মা ও শিশু কল্যাণ প্রকল্প চালু হয় তা এখনও অব্যাহত আছে। এই প্রকল্পে উপকৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ। এছাড়া ৩,২০০ মহিলার আংশিক ও ৯০ জনের পূর্ণ নিয়োগ সম্ভব হয়েছে। ৭৪টি বালওয়াড়ি কেন্দ্রে এবং অন্যান্য সরকার অনুমোদিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৮,২০০ শিশুর ভরণপোষণ ও শিক্ষা

চলছে। দুঃস্থ শিশুদের জন্য দীঘায় 'ছুটি' নামে একটি হলিডে হোম খোলা হয়েছে। বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সূচী ও সীবন প্রশিক্ষণ প্রকল্পে ৭৬টি ব্লকে প্রতি বৎসর প্রায় ৩,৮০০ জন মহিলা প্রশিক্ষণ লাভ করছেন। বাৎসরিক ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৪টি পরিবার ও শিশু কল্যাণ প্রকল্পে অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে ৭,২০০ অনাথা বিধবাকে মাসে ত্রিশ টাকা ভাতা

প্রতিবন্ধীদের সেলাই শিক্ষাকেন্দ্র

দেওয়া হচ্ছে। দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৮৩র নভেম্বরে কৃষ্ণনগরে একটি আবাস খোলা হয়েছে। এসব ছাড়া ৩,৪০০ জন প্রতিবন্ধীকে ১৯৮১ সাল থেকে অক্ষম ভাতা দেওয়া হচ্ছে। চলাফেরা ও কাজকর্মের সুবিধার জন্য প্রতিবন্ধীদের বহু ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দেওয়া হয়। নবম শ্রেণীর নিচে পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ও তাঁদের কল্যাণে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমানে ভবঘুরে আবাসে ২,৪০০ জনের ভরণ-পোষণ এবং প্রশিক্ষণ চলছে। আরো ৪০০ জন ভবঘুরেকে আশ্রয় দেবার জন্য মুর্শিদাবাদ ও হাওড়ার আবাসদুটিকে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। ৪,০০০ জন অনাথ শিশুর ভরণপোষণ ও শিক্ষার জন্য এই দপ্তর প্রতিমাসে ৩০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে। বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পে প্রতিমাসে ৩০ টাকা হারে ৩০,০০০ বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। পতিতাবৃত্তি নিরোধক আইনে ৩৬০ জন বালিকাকে ৬টি প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া মেদিনীপুরের ডেবরায় সরকারি ব্যয়ে ১৪ জন পতিতাকে মাদুর তৈরি শেখানো হচ্ছে।

এভাবে অসংখ্য প্রকল্প ও ব্যবস্থার মাধ্যমে অবহেলিত সমাজকল্যাণ বিভাগকে গত সাত বছরে উজ্জীবিত করা হয়েছে।

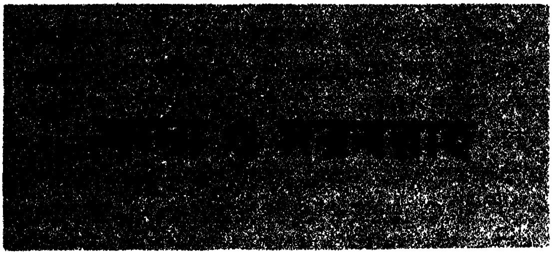

১৯৭৭ সালের আগে পর্যন্ত রাজ্যের মোট জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ বিধিবদ্ধ রেশনিং-এর সুযোগ পেতেন। বিধিবদ্ধ রেশনিংএ চাল, গম ও চিনি দেওয়া হত।

এর বাইরে সংশোধিত রেশন এলাকায় এসবের দেখা মিলত কদাচিৎ। ভারতের মধ্যে এরাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম ১৪টি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের ব্যাপক রেশনিং প্রথা চালু করার সুপারিশ করেন। এই সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে ডাল, ভোজ্য তেল, গায়ে মাখা ও কাপড় কাঁচা সাবান, শাড়ি, খাতা, দেশলাই, মোমবাতি, গুঁড়ো মশলা প্রভৃতির বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকা ছাড়াও সংশোধিত রেশনিং এলাকায় বণ্টন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ আজ নির্ধারিত মূল্যে সরকারি বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যশস্য ও চিনি পাচ্ছেন। খাদ্য কর্পোরেশন যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সামিগ্রী সরবরাহ না করায় মাঝে মাঝে বণ্টন ব্যবস্থায় কিছু গোলমাল দেখা দেয়।

খাদ্য ও সরবরাহ

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮৪-৮৫
১। আর্থিক বায়বরাদ্দ	১৬,৯১,১৯,০০০ টা	৩১,১৩,৯৮,০০০টা (খাদ্য) ৫৯,০৬,০০০ টা (সরবরাহ)
২। বিধিবদ্ধ রেশন দোকানের সংখ্যা	২,৭১৪ (১৯৭৭)	২,৭৪৯(১৯৮৩)
৩। সংশোধিত রেশন দোকানের সংখ্যা	১৫,০৯৯ (১৯৭৭)	১৫,৮৮৫ (১৯৮৩)
৪। সরকারি বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বণ্টন করা খাদ্যশস্যের পরিমাণ	১৬,১২,৫০০ মে. টন	২৯ লক্ষ মে. টনের বেশি (১৯৮৩-৮৪)
৫। ভোজ্য তেল সরবরাহ	৮০০ মে. টন	৭৭,০০০ মে. টন (১৯৮৩-৮৪)
৬। কেরোসিন	৩,৪১,৪১০ মে. টন	৪,৯৭,৩০০ মে. টন (১৯৮৩-৮৪)
৭। চিনি		২.৮৫ লক্ষ মে. টন (১৯৮৩)

১৯৭৩ সাল পর্যন্ত এ রাজ্যে ৬০ শতাংশ লোকের রেশন কার্ড ছিল। এখন প্রায় সবারই রেশন কার্ড হয়েছে এবং ব্যক্তিগত রেশনকার্ড প্রথা চালু হওয়ায় রেশন তোলার ক্ষেত্রে গরিব মানুষের খুবই সুবিধা হয়েছে। বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকা সম্প্রসারিত করে খাদ্যশস্য বন্টনের পরিমাণ সপ্তাহে মাথাপিছু ২.৫ কেজি করা হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত সংশোধিত রেশনিং এলাকায় যাতে মাথাপিছু ৭০০ গ্রাম দানা জাতীয় খাদ্যশস্য দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা হয়েছে।

বামফ্রন্ট আমলে ১৯৮৩ সালে ২৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য রেশন মারফত বন্টন করা হয়। এটি একটি সর্বকালীন রেকর্ড। এরাজ্যে জ্বালানি কয়লার ১৫,২৫০, কেরোসিনের ২৯,৮৬১ এবং সিমেন্টের ২,৪৪৮ জন ডিলার রয়েছে। বিভিন্ন কো-অপারেটিভ মারফত জনতা শাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছে। এ রাজ্যে ভোজ্য তেলের অভাব মেটাতে পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগম ১৯৮৩ সালে ৭৭,০০০ মেট্রিক টন তেল বন্টন করেছে। ১৯৭৬ সালে এর পরিমাণ ছিল ৮০০ মেট্রিক টন। এই নিগম প্রতিদিন ১০০ টন শোধন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি রেপসীড তৈল শোধনাগার স্থাপন করেছে।

এই অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগম ১৯৭৪-৭৫ সালে ১২.৩১ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। ১৯৮৩-৮৪ সালে ১১০ কোটি টাকার ব্যবসা করে

লাভ করেছে ১০.৮ কোটি টাকা। কেন্দ্র সিমেন্ট সরবরাহ কমিয়ে দেওয়ায় রাজ্য বাইরে থেকে সিমেন্ট আমদানি করছে। একইভাবে খাদ্যশস্য, চিনি, ডাল ইত্যাদিও জনস্বার্থে আমদানি করে নায্যমূল্যে জন-সাধারণকে সরবরাহ করা হচ্ছে।

মূল্য পরিস্থিতির উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যকলাপের উপর। দরদামের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের যা করণীয়, তার সবটাই করা হয়েছে। এখনও ভারতের মধ্যে জীবন যাত্রার খরচ পশ্চিমবঙ্গেই সবচেয়ে কম।

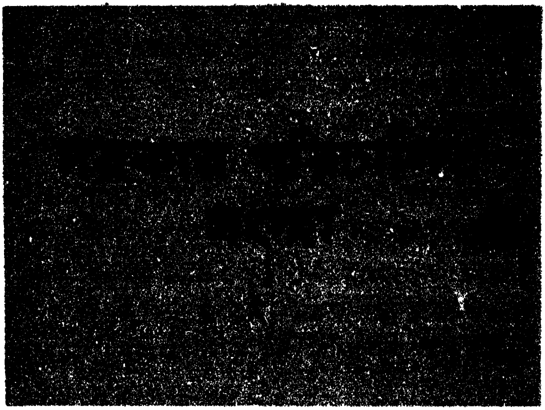

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত সংস্থাসমূহের তত্ত্বাবধান ও উন্নতি সাধনের জন্য এই বিভাগের সৃষ্টি। বর্তমানে এই বিভাগের অধীনে ৯টি সংস্থা রয়েছে। এগুলি হল: (১) দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিঃ, (২) দুর্গাপুর কেমিক্যালস্ লিঃ, (৩) কল্যাণী স্পিনিং মিলস্ লিঃ (৪) ওয়েস্টিংহাউজ স্যাক্সবি ফার্মার লিঃ, (৫) ইলেক্ট্রো-মেডিক্যাল অ্যান্ড অ্যালায়েড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, (৬) ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশন লিঃ, (৭) ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিঃ, (৮) ওয়েস্ট বেঙ্গল সিরামিক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ, (৯) ওয়েস্ট দিনাজপুর স্পিনিং মিলস্। এগুলির প্রথম ৮টির-কর্মিসংখ্যা প্রায় ১৪,৭১২ জন।

উল্লেখ্য, দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিমিটেডকে পূব ভারতের একমাত্র শিল্পের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বলে আখ্যা দেওয়া যায়। ১৯৮২-৮৩ সালে এই সংস্থাটির লাভের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। আগে প্রতি বছরই লোকসান হত।

১৯৭৭ থেকে ১৯৮২-৮৩'র মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড সংস্থাটি বছরে গড়ে ১০ লক্ষ টাকার মত লাভ করে। ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ পর্যন্ত এটিতে বার্ষিক লোকসানের পরিমাণ ছিল ৩৩.৪২ লক্ষ টাকা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশন লিমিটেড সংস্থাটিতে ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮২-৮৩ পর্যন্ত বার্ষিক লাভের পরিমাণ হয় গড়ে ১৫.১৩ লক্ষ টাকা।

৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় এই বিভাগের যোজনা বরাদ্দ মোট ১০৪ কোটি টাকা। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি হল দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিঃ কর্তৃক ১১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৬ষ্ঠ বিদ্যুৎ ইউনিট স্থাপন ও পুরনো বিদ্যুৎ ইউনিটগুলির নবীকরণ, শিল্প ও খনিজ খাতে উক্ত কোম্পানির দৈনিক জল সরবরাহ ক্ষমতা ৩৫ মিলিয়ন গ্যালন থেকে ৪১ মিলিয়ন গ্যালনে বৃদ্ধি করার প্রকল্পটি বর্তমানে শেষ পর্যায়ে।

বিদ্যুৎ

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে বিদ্যুৎউৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ছিল পথিকৃৎ। কিন্তু, পরবর্তী ত্রিশ বছরে রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ঐ সময়কালে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু যেখানে২,০০০ মেগাওয়াটের বেশি বাড়তি বিদ্যুৎ সংস্থানের ব্যবস্থা করেছে সেখানে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাত্র ১,৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। এর ফলে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারকেএক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। পূর্ববর্তী আমলের অব্যবস্থা এবং চূড়ান্ত অপদার্থতার মোকাবিলায় বামফ্রন্ট সরকার গত সাত বছরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। বিদ্যুৎ উপাদন এবং সরবরাহের জন্য ৯০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করেছে। এই বিনিয়োগের পরিমাণ স্বাধীনতার পরবর্তী ত্রিশ বছরে মোট বিনিয়োগের চেয়ে বেশি। এর ফলে গত সাত বছরে ৯২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চলতি বছরে ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

বিদ্যুৎ চিত্র

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
১। আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ	৬৯.৫২ কোটি টাকা	–	১৭০.১২ কোটি টাকা
২। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন	২,৩,৪৩ .৯৭ লক্ষ কিলোওয়াট ঘণ্টা	৩৭,০০০ লক্ষ কিলোওয়াট ঘণ্টা (অনুমিত)	৪৬,৫৫০ লক্ষ কিলোওয়াট ঘণ্টা (লক্ষ্যমাত্রা)
৩। রাজ্যের মোট উৎপাদন ক্ষমতা	১,৭৪৯ মেগাওয়াট	২,৩৫৯ মেগাওয়াট	–
৪। রাজ্যের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন	৫০,০০০ লক্ষ ইউনিট	–	৫৯,০০০ লক্ষ ইউনিট (লক্ষ্যমাত্রা)
৫। বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	১০,৯৮১ (২৮.৮৪%)	১৯,৯৬৪ ৪৯.৫%	

আশা করা হচ্ছে, আগামী চার বছরের মধ্যে কোলাঘাটের৬৩০ মেগাওয়াট এবং রাম্মাম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘিতে ২,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বীরভূমের বক্রেশ্বরেও একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে তিস্তা নদীর জল থেকে ৬৬.৫ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। লোধামা ও মংপুর জল সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ৯ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রকল্প তৈরির কাজ এগিয়ে চলেছে।

নতুন নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন ছাড়াও পুরনো কেন্দ্রগুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের দিকেও বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। বিদ্যুতের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে এবং কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে টিটাগড়ে নতুন বিদ্যুৎপ্রকল্প স্থাপনে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দিয়েছে এবং অন্যত্র আরো দুটি ইউনিট স্থাপনে অনুমতি দিয়েছে।

কৃষি এবং গ্রামীণ মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যুৎ বিভাগ এ পর্যন্ত ১৯,৯৬৪টি মৌজায়

(৪৯.৫%) বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। এছাড়া, ২৫,৪১০টি অগভীর নলকূপ, ২,৮১৩টি গভীর নলকূপ এবং ৮৫৭টি নদী জল-উত্তোলন পাম্পকে বিদ্যুতায়িত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ও সেচের পাম্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে। যে সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে তার মধ্যে ৩,৬১০টি তফসিলী জাতি ও আদিবাসী অধ্যুষিত। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ, তার রক্ষণ এবং সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত, জনপ্রতিনিধি এবং গণ সংগঠনের সাহায্য গ্রহণ বামফ্রন্ট সরকারের বিদ্যুৎ নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ প্রকল্প করা যায় না বিদ্যুৎ সংকটের সামগ্রিক সমাধানের জন্য অনেক-গুলি প্রকল্প ও কর্মসূচি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদ-নের অপেক্ষায় রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। এই অবস্থার মধ্যেও সাত বছর ধরে জটিল বিদ্যুৎ সমস্যার মোকাবিলায় বিরাটসর্বাঙ্গীণ অগ্রগতি প্রশংসার দাবি রাখে।

পরিবহণ

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পরিবহণ সংস্থারই উন্নতি সাধনের দায়িত্ব সরকারের। একথা মনে রেখে বামফ্রন্ট সরকার পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৪-৮৫র বাজেটে এই বিভাগের জন্য ৬৮,৮৭,৯৪,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ এ এই পরিমাণ ছিল ৭,৫৫,১৬,০০০ টাকা।

বামফ্রন্টের পরিবহণ কর্মসূচিতে স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতাই প্রাধান্য পেয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের ঋণের সহায়তায় কলকাতা নগর পরিবহণ পরিকল্পনায় গত ৭ বছরে যানের সংখ্যা বেশ বেড়েছে। এ সত্ত্বেও যানবাহনের সমস্যা রয়েছে। জনসংখ্যার তুলনায় তা অপ্রতুল ও অনিয়মিত। এই সময়ে কলকাতা ট্রাম কোম্পানিতে নতুন নির্মিত ট্রামের সংখ্যা-৭৫, পুনর্নির্মিত ট্রামের সংখ্যা-৬০ এবং বিশেষভাবে সংস্কৃত ট্রামের সংখ্যা ১০৫। কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কর্পোরেশন এ পরিকল্পনায় এ পর্যন্ত ৫৩০টি বাস কিনেছেন। ১৯৭৭-৮৩র মধ্যে কলকাতা ও

শহরতলিতে ২২টি নতুন বাসরুট চালু হয়েছে। কসবা, বেলঘরিয়া, পাইকপাড়া ও লেক ডিপো এবং ইউনিট এক্সচেঞ্জ শপের নির্মাণ কাজ বর্তমানে চলছে। নোনাপুকুর ওয়ার্কশপ সমেত বিভিন্ন ট্রাম ডিপো নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। ১৯৮৩ সালে রাজাবাজার ও কালিঘাট ট্রাম গুমটিতে যথাক্রমে ১০০ ও ৫০টি লাইনযুক্ত টেলিফোন (আর.এ.এক্স) এক্সচেঞ্জ বসানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, নোনাপুকুরে ১৫০ লাইনের অনুরূপ একটি এক্সচেঞ্জ বসানোর কাজ শীঘ্রই শেষ হবে।

সি.এম.ডি.এর সি.টি.ই.পি প্রকল্পে বিভিন্ন রাস্তার উন্নয়ন ও সিগন্যাল স্থাপনের প্রস্তাব বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন। সি.এম.ডি.এ-র উল্টো-ডাঙা বাস টারমিনাস নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পথে।

জল পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বামফ্রন্ট আমলে হাওড়া থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট, চাঁদপাল ঘাট, গার্ডেন রিচ এবং বাগবাজারের মধ্যে নিয়মিত লঞ্চ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। চন্দননগর থেকে বজবজ পর্যন্ত নদীবক্ষে আরও কয়েকটি নতুন সার্ভিস প্রবর্তনের পরিকল্পনা রয়েছে।

সরকারি ব্যবস্থা ছাড়াও বেসরকারি যানবাহন যাত্রী পরিবহণের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ অতি সম্প্রতি বিভিন্ন রুটে ৫০১টি মিনিবাস, ৪১৪টি বাস, ৮৪৭টি

অটো-রিকসার পারমিট দিয়েছে। মাত্র গত এক বছরে ট্যাক্সির সংখ্যা ১,৩৩০টি বেড়ে মোট ৭,৭৮৫টিতে দাঁড়িয়েছে। আইনগত বাধার জন্য বাস, মিনিবাস ও অটো-রিক্সার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা যায়নি। গত বছরে পুরুলিয়ায় ৪২৩টি, বাঁকুড়ায় ২১২টি বর্ধমানে ১৩৪টি, কোচবিহারে ৪২টি বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আন্তঃরাজ্য চলাচলের জন্য ৬৭টি মিনিবাস, কলকাতা-শিলিগুড়ি রুটে ৬টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস এবং অন্যান্য জেলাতেও বহু সংখ্যক বেসরকারি বাস চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কলকাতা ও ভূটানের মধ্যে বাস চলাচল চালু হচ্ছে।

অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প অনুযায়ী গত এক বছরে ৪২,৬৪,৭২৬ টাকা ব্যয়ে ১,৫০০ ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতা ও ২৪ পরগনায় ১,২৫৩টি যাত্রী শেড নির্মিত হচ্ছে। ৯১.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলকাতা ও আশেপাশে ১১টি বাস টার্মিনেটিং পয়েন্ট নির্মাণের কাজ চলছে। দমদম রোড, বি টি রোড সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে।

পরিবহণের সমস্যা রয়েছে। কিন্তু গত সাত বছরে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ১৯৭৭ সালের তুলনায় অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটেছে। ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে বিরাট উন্নতি করা হলে কলকাতা ও জেলাগুলিতে যাত্রী-পরিবহণের চাপ অনেক কম পড়ত।

বন

প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা এবং অন্যান্য কারণে বনের গুরুত্ব অপরিসীম। পশ্চিমবঙ্গে মোট ১১,৮৬,০০০ হেক্টেয়ার বন এলাকার মধ্যে ৬,৯৯,৮৪৩ হেক্টেয়ার সংরক্ষিত বন এবং ৪,২৫,২০৮ হেক্টেয়ার সুরক্ষিত। এ রাজ্যে ভৌগোলিক আয়তনের মাত্র ১৩.৪ শতাংশ বনভূমি, যেখানে জাতীয় বননীতিতে নির্ধারিত কাম্য গড় হিসাব হল ৩৩ শতাংশ। ঘন বসতি, পরিকল্পনাবিহীন শিল্পায়ন ও ক্রমবর্ধমান বনাঞ্চল ধ্বংসের বিরুদ্ধে আগের আমলে কোনরকম ব্যবস্থা

না নেবার ফলে এ রাজ্যে বনাঞ্চলের এই করুণ দশা। ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে ৩২৫ হাজার হেক্টেয়ার বনাঞ্চল ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু তা পূরণের কোন চেষ্টা হয়নি।

এই ভগ্নদশা থেকে রাজ্যকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে গেছে সাত বছরের বামফ্রন্ট সরকার। ১৯৭০-৭৪ সালে গাছ লাগানোর বার্ষিক গড় ছ হাজার হেক্টেয়ার, ১৯৮০-৮৪ সালে লাগানোর বার্ষিক গড় ১৬ হাজার হেক্টেয়ার, ১৯৭৫ সালে মানুষের মধ্যে চারাগাছ বিলি হয় ১২ লক্ষ, ১৯৮৩ সালে ৪৪০ লক্ষ।

আগের আমলে অসাধু ঠিকাদারদের কাঠ চুরির ব্যবসা এখন বন্ধ করা হয়েছে। কাঠ সংরক্ষণ, চেরাই ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলির অনেকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বনসৃজন ও বনরক্ষা, মৃত্তিকা সংরক্ষণ প্রভৃতি নতুন নতুন উদ্যোগ যা নেওয়া হয়েছে, স্বাধীনতার পর ২৮ বছর ধরে কখনও তা হয়নি।

১৯৭৭ সাল থেকে বনসৃজনের কাজ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে ১১,১২০ হেক্টেয়ার জমিতে গাছ লাগানো হয়েছিল। ১৯৮২-৮৩ সালে ঐ পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৭,১২২ হেক্টেয়ার। ব্যাপক গাছ লাগানোর কর্মসূচি নেওয়ার ফলে গ্রামের বিরাট সংখ্যক লোককে কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠান ও গ্রামাঞ্চলের জ্বালানি চাহিদার প্রতি লক্ষ্য

রেখে বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে। সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্পে মোট ৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এর ফলে ৯৩ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে বনসৃজন সম্ভব হয়েছে এবং আড়াই কোটি শ্রমদিবস সৃষ্ট হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে ১,৭৫০ হেক্টেয়ার জমিতে জ্বালানি কাঠের বন তৈরি হয়েছে। কাঠ সংগ্রহ প্রকল্প অনুযায়ী ১৯৮২-৮৩ সালে ৬৬,০০,০০০ ঘন মিটার কাঠ সংগৃহীত হয়। এই পরিকল্পনায় জঙ্গলনিকটবর্তী অঞ্চলের মানুষের জন্য ন্যায্য মজুরিতে ১৫০ দিন কাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে এবং আদিবাসী যুবকদের যন্ত্র মারফত কাঠ চেরাই-এর কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। খরাপ্রবণ এলাকাগুলিতে 'বনসৃজন' প্রকল্পের জন্য ১৯৭৭-৭৮ সালে ৫৩.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। ১৯৮২-৮৩তে ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ১৯৭৭-৭৮ সালে আই টি ডি সি পরিকল্পনায় ব্যয় হয়েছিল ১৬.৫৫ লক্ষ টাকা। ১৯৮২-৮৩তে ঐ ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮ লক্ষ টাকা।

আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার বনাঞ্চলে এই শ্রেণীর মানুষকে তাঁদের চিরাচরিত অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার বিনামূল্যে জ্বালানি, মহুয়া, শাল, কেন্দু প্রভৃতি গাছের পাতা ও ফল বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে দিচ্ছে।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। '৭৭-৮২ সালে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও মালদায় তিনটি মৃগোদ্যান তৈরি হয়েছে। জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য ১৯৮৩ সালে ৮টি স্থায়ী এবং তিনটি চলমান বেতার কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। সুন্দরবনের কুমীর ও ব্যাঘ্র প্রকল্প চালু হয়েছে। বিলুপ্তপ্রায় অলিভ বিডলে কচ্ছপ, চিতল হরিণ ও কুমীরের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও সাফল্য লাভ করেছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর '৭৭-৭৮ সালে বন উন্নয়ন কর্পোরেশনের আয় হয়েছিল ১৫২.০৮ লক্ষ টাকা, আর ১৯৮২-৮৩তে আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৪৪৫.৮৮ লক্ষ টাকা।

এই বিভাগে বামফ্রন্ট সরকারের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল উদ্যান ও কানন শাখা। হতশ্রী পার্ক ইত্যাদিতে গাছ লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সব জেলাতেই উদ্যান তৈরি, পুষ্প প্রদর্শনী ও বৃক্ষরোপণের দ্বারা এই শাখা ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির দ্বারা জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে।

বন সৃজন ও উন্নয়নের উদ্যোগ

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
১। আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ			লক্ষ টাকা ২,১৫৮.১৬
২। বন উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেডের আয়	১৫২.০৮ লক্ষ টা: (১৯৭৭-৭৮)	৪৪৫.৮৮ লক্ষ টা: (১৯৮২-৮৩)	
৩। মোট বনাঞ্চল	১১,৮৬,০০০ হে: (১৯৭৬-৭৭)	১১,৮৬,০০০ হে: (১৯৮১-৮২)	
৪। বন উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক শ্রমদিবস সৃষ্টি	২৩ লক্ষ (১৯৭৬-৭৭)	৭০ লক্ষ (১৯৮২-৮৩)	
৫। চারা বিতরণ	১২ লক্ষ (১৯৭৬-৭৭)	৪৪০ লক্ষ (১৯৮৩-৮৪)	

পর্যটন

পর্যটন শুধুমাত্র সম্পন্ন লোকের জন্য নয়। মধ্যবিত্ত, নিম্ন আয়ের মানুষকেও এব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে হবে, তাঁদের জন্যও সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করতে হবে—এটাই হল বামফ্রন্ট সরকারের পর্যটন সংক্রান্ত নীতি। সাধারণ মানুষের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখে এখন পর্যটন পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে। '৭৭ পূর্ববর্তী সময়ের সঙ্গে এটাই হল মূল পার্থক্য।

পর্যটন

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮৪-৮৫
১। আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ	৫১,০২,০০০ টা:	১,৫১,৮৮,০০০ টা:
২। পর্যটন আবাস ও সেগুলির শয্যাসংখ্যা	১৯ (৭৮৩)	৩৩ (১,১৬১)
৩। এই বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ভ্রমণের সংখ্যা	(১৯৭৭-৭৮) ৬৬৪	৭৭৪

কিন্তু পূর্বাঞ্চলে পর্যটনের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার কোনদিন নজর দেয়নি। বামফ্রন্ট সরকার এই নীতি পরিবর্তনের দাবি বার বার জানিয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নির্মিত উল্লেখযোগ্য পর্যটক আবাসগুলি হল (১) দার্জিলিং জেলার মনোরম মিরিক–এখানে ১.৫ কি.মি. দীর্ঘ হ্রদে নৌচালনার ব্যবস্থা রয়েছে, রয়েছে বিশ্রাম গৃহ এবং ৬০ শয্যাবিশিষ্ট ট্যুরিস্ট হোস্টেল ও ৮ শয্যার ৩টি কটেজ। এছাড়া তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে। (২) জলপাইগুড়ি জেলার মাদারিহাট পর্যটক আবাস (৩) ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে ৮টি কটেজ (৪) কালিম্পঙে 'হিল টপ' ট্যুরিস্ট লজ (৫) বাঁকুড়ার মুকুট–মণিপুরে ২টি কটেজ (৬) ঝাড়গ্রামের কাছে কাঁকড়াঝোড়ে ট্যুরিস্ট হোস্টেল (৭) পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে ট্যুরিস্ট হোস্টেল (৮) হুগলি নদী ও রূপনারায়ণের সঙ্গমস্থলে গাদিয়াড়ায় পর্যটক আবাস (৯) মাইথনে পর্যটক আবাস (১০) ২৪ পরগনার পারমদানে পর্যটক আবাস (১১) আসানসোলে পর্যটক আবাস (১২) সুন্দরবনের সজনেখালিতে পর্যটক আবাস (১৩) কলকাতার লবণহ্রদে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট যুব আবাস। এছাড়া ট্রেকিং-এ উৎসাহীদের সুবিধার জন্য ধোত্রে, গৈরিবাস, ফালুট এবং কালপোখারিতে আবাস তৈরির কাজ এগিয়ে চলেছে। একই উদ্দেশ্যে সংস্কার করা

হচ্ছে মানেভঞ্জন, সন্দকফু, রাম্মাম ও রিমবিকের যুব আবাসগুলি। রাজ্যে পর্যটন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্য পর্যটন উন্নয়ন নিগম গঠিত হয়েছে। এদের উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল (১) উত্তরবঙ্গের মালবাজারে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন (২) কার্শিয়াঙে পর্যটন আবাস (৩) কালিম্পঙে ট্যুরিস্ট লজ (৪) বকখালি ও দীঘা পর্যটন আবাসের শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি (৫) নদিয়ার বেথুয়াডহরীতে রেস্তোরা ও

পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ—বকখালি

বিশ্রামগৃহ এবং পিকনিক শেড নির্মাণ (৬) রায়গঞ্জে পর্যটক আবাস নির্মাণ (৭) ঝাড়গ্রাম প্যালেসে ট্যুরিস্ট লজ। এসব ছাড়াও বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক মন্দিরগুলিতে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা হয়েছে। সুন্দরবন এবং গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণের জন্য রয়েছে জলযান, রয়েছে দুটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ি। সাম্প্রতিক কালে এই বিভাগ আয়োজিত ভ্রমণগুলি রাজ্যের গন্ডি ছাড়িয়ে অন্যান্য রাজ্যেও প্রসারিত হয়েছে। দার্জিলিং পাহাড়ী অঞ্চলে ভ্রমণের ক্ষেত্রে অহেতুক পারমিট প্রথা কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যাহার করে নিলে এরাজ্যে পর্যটন শিল্প আরো দ্রুত বিস্তার লাভ করত।
কলকাতা বিমানবন্দরের গুরুত্ব একেবারেই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এ রাজ্যের অর্থনীতি যেমন মার খাচ্ছে, তেমনি পর্যটনও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র দার্জিলিং কখনই কেন্দ্রের সুনজর লাভ করেনি।

অন্য রাজ্যের পর্যটকদের নানা তথ্য সরবরাহের জন্য দিল্লী ও মাদ্রাজে দুটি তথ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। শিক্ষামূলক ভ্রমণে উৎসাহ দেবার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই বিভাগ থেকে ভ্রমণভাতা দেওয়া হয়। পর্যটন বিভাগের পরিচালনাধীন কলকাতার ঐতিহ্যমন্ডিত গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল লোকসানের দিন শেষ করে এখন ক্রমবর্ধমান লাভের পথে চলেছে।

পরিবেশ

বৈষয়িক প্রগতির সাথে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফ্রন্ট সরকার ১৯৮২ সালে দ্বিতীয় বার সরকার গঠনের সময় রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম পরিবেশের জন্য একটি পৃথক বিভাগ গঠন করল। এই বিভাগের প্রধান কাজ হল—১) বায়ু ও জল দূষণ রোধ, ২) রাজ্যের বিভিন্ন বটানিক্যাল গার্ডেন ও পশুশালা সংরক্ষণ, (৩) পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এগুলি রূপায়ণের সমন্বয় সাধন। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এই বিভাগ বর্তমানে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, 'স্মোক ন্যুইস্যান্স কমিশন', আলিপুর চিড়িয়াখানা, দার্জিলিং-এর পদ্মজা নাইডু জুলজিক্যাল পার্ক ও লয়েড বটানিক গার্ডেনের কাজকর্ম দেখছে। তাছাড়া জনস্বাস্থ্য, শিল্পবাণিজ্য, পৌর প্রশাসন, কৃষি ও অরণ্য, বিদ্যুৎ, পরিবহণ, সেচ প্রভৃতি কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে নীতি প্রণয়নের চেষ্টা করছে। নাগরিকদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

৩১।১২।৮৩ পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প ও অন্যান্য সংস্থা তাদের সঞ্চিত আবর্জনা নদী, কূপ বা ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীতে ফেলার জন্য 'দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে'র কাছে ১৩,০৪৮টি দরখাস্ত জমা দিয়েছে। এর মধ্যে ৪৪৯টি ক্ষেত্রে সাময়িক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ৩৪টি শিল্প এ পর্যন্ত তাদের কারখানা দূষণ মুক্ত করতে রাজী হয়েছে। জনস্বাস্থ্য দূষিত করার দায়ে পর্ষদ এ পর্যন্ত ৬টি শিল্পের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করেছে।

'বেঙ্গল স্মোক ন্যুইস্যান্স অ্যাক্ট' (১৯০৫) বলে গঠিত 'স্মোক ন্যুইস্যান্স কমিশন' এ পর্যন্ত ৪৫৩টি চিমনির অনুমোদন করেছেন। 'বেঙ্গল স্মোক ন্যুইস্যান্স অ্যাক্ট' লঙ্ঘনের দায়ে কমিশন এ পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানাকে ৫,৪০২টি নোটিশ দিয়েছেন, মামলা রুজু করেছেন ৪টি এবং ৪১টি কারখানার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুমোদন করেছেন। এ ছাড়া 'দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ', জলদূষণ মাত্রা পর্যালোচনার জন্য গত ৩ বৎসর ধরে হুগলি ও অন্যান্য নদীর জলের নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে।

আলিপুর চিড়িয়াখানার উন্নতিসাধন কল্পে পরিবেশ বিভাগ গত ২ বছরে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যানবাহনের ক্ষেত্রে মোটর গাড়ির হর্ন ও কালো ধোঁয়ার দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ বিভাগের উদ্যোগে অভিযান চালানো হচ্ছে।

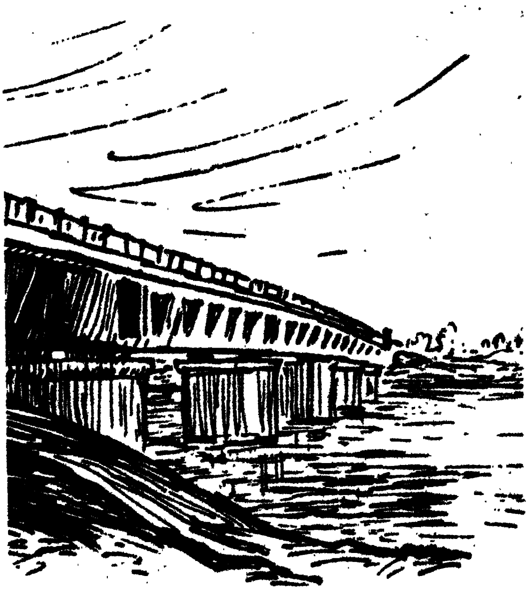

পূর্ত ও আবাসন

'৭৭ থেকে '৮৩ এই সময়কালের মধ্যে পূর্ত বিভাগ অসংখ্য রাস্তাঘাট, বহু সরকারি ভবন, আবাসিক গৃহ ও সড়ক সেতু নির্মাণ এবং কালভার্ট স্থাপন করেছে।

পূর্ত ও আবাসন

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
১। আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ			৬০১৬.৯৩ লক্ষ টাকা
২। নির্মিত ভবনের ও ভবন সম্প্রসারণের সংখ্যা	৬ ('৭৭ পর্যন্ত)	১৩ (বর্তমানে আরও ২টি নির্মীয়মাণ)	–
৩। পাকা রাস্তা নির্মাণ	৬৯০ কি.মি. ('৭৩–'৭৭)	১,৬২১ কি.মি. (১৯৭৭–'৮৩)	
৪। সরকারি উদ্যোগে নির্মিত গৃহ	২৩,২০০ ইউনিট	২৭,০০০ ইউনিট	
৫। চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রের সাহায্য ও ভরতুকির মাধ্যমে নির্মিত আবাস	২,১০০ ইউনিট	১৩,০০০ ইউনিট	

গত সাত বছরে যে নয়টি প্রধান ভবন এই বিভাগ কর্তৃক নির্মিত হয়েছে সেগুলি হল (১)পূর্তভবন, বিধাননগর (২) কলকাতার টেরিটি বাজারে পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস্ অফিস, (৩) আলিপুর ভবানী ভবন প্রাঙগণে দশতলা ভবন (৪) বর্ধমান সদরঘাটে আটতলা অফিস বাড়ি (৫) হাঙগারফোর্ড স্ট্রীটে সার্কিট হাউস (৬) কিড স্ট্রীটে সরকারি অতিথি নিবাস, (৭) নতুন দিল্লীর বঙগভবন (৮) মহাজাতি সদন ও প্রেক্ষাগৃহের আধুনিকীকরণ ও ৪নং মিত্র লেনে নতুন ভবন নির্মাণ (৯) অগ্নি বিধ্বস্ত কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট

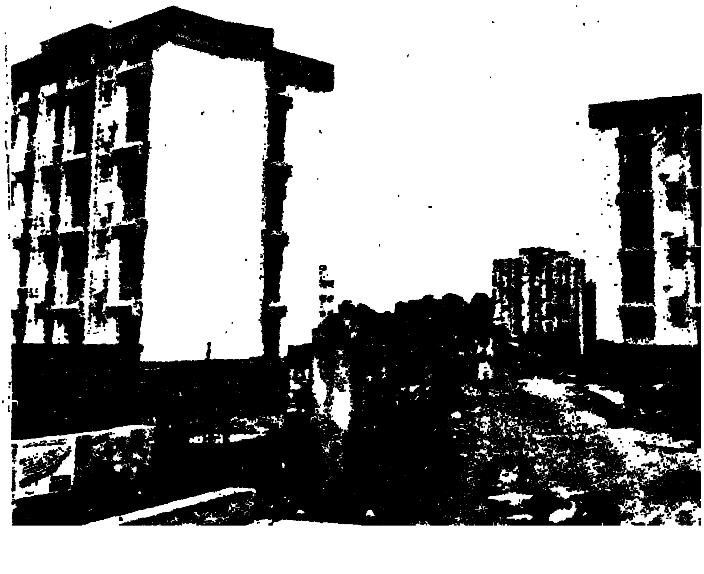

ভবন ও প্রেক্ষাগৃহের পুনর্নির্মাণ। এছাড়া শিলিগুড়ি তথ্যকেন্দ্র, আসানসোলে রবীন্দ্রভবন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ভবন, পুলিস কম্পিউটার কেন্দ্র নির্মাণ প্রভৃতি কয়েকটি বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যেসব সেতু নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে বর্ধমান জেলার সদরঘাটে কৃষক সেতু, বালুরঘাটে আত্রাই সেতু, মাথাভাঙ্গা নদীর উপর মানসাই সেতু উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নবদ্বীপে ভাগীরথী নদীর উপর সেতু, জলঙ্গীর উপর দ্বিজেন্দ্র সেতু, আমতায় দামোদরের উপর সেতু, নরঘাট সেতু, কুঠিঘাটে সুবর্ণরেখার উপর সেতু, পটাশপুরে কেলেঘাই সেতু, দার্জিলিং-এ বুড়ি বালসার সেতু, বাঁকুড়ার চন্ডীদাস সেতু, মুর্শিদাবাদে নলিনী সেতুর নাম উল্লেখযোগ্য। কল্যাণী ও কলকাতায় হুগলি নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। এছাড়া অজয়, ময়ূরাক্ষী ও কুঁয়ে নদীর উপর তিনটি সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদা জেলায় আটটি নদী সেতু নির্মাণের কাজ চলছে।

৭২-৭৭ সালে যেখানে মোট ৬৯০ কিলোমিটার নতুন সড়ক তৈরি হয়েছে, সেখানে ৭৭-৮০ সালে নির্মিত রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৯,৬২৯ কিলোমিটার।

এই বিভাগ, এ পর্যন্ত নিজেরা ২৭,০০০ আবাস ইউনিট নির্মাণ করেছে এবং জনসাধারণকে ঋণ দিয়ে ২৫ হাজার ইউনিট নির্মাণে সাহায্য করেছে। তাছাড়া চা-বাগিচা শ্রমিকদের জন্য নির্মাণ করেছে ১৫,১০০টি ইউনিট। রাজ্য আবাসন পর্ষদ এ পর্যন্ত ১২,১০০টি ইউনিট জনসাধারণকে বিক্রয় করেছে। পর্ষদ বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৫৮টি খন্ড বাসযোগ্য ভূমি উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছে এবং এ কাজ শেষ হলে ন্যায্য দামে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হবে। এই বিভাগের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল বিদেশী শাসকদের মূর্তি অপসারণ করে জাতীয় মনীষীদের মূর্তি স্থাপন।

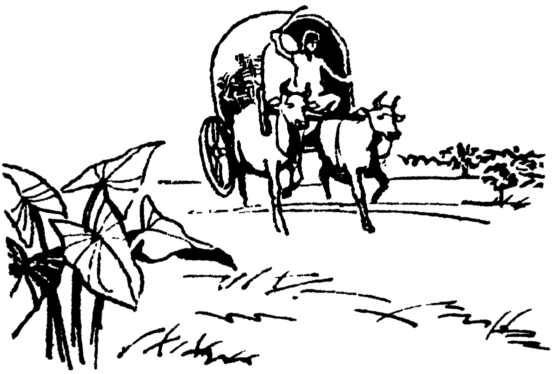

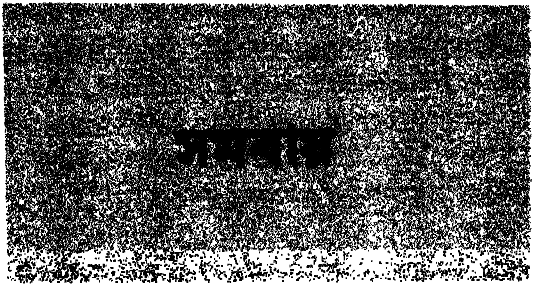

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজকের দিনে সমবায় একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এই আন্দোলনকে জোরদার করতে গত ৭ বছরে সমবায় দপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ–

সমবায় বিপণন ঃ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ২৬৮টি সমবায় বিপণন সমিতি আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন, সেন্ট্রাল সোসাইটি (বর্ধমান সেন্ট্রাল অ্যাগ্রিকালচারাল প্রোডাকসন অ্যান্ড মার্কেটিং কো-অপারেশন সোসাইটি লিমিটেড) ও ২৬৭টি প্রাথমিক বিপণন সমবায় সমিতি রাজ্যে সমবায় বিপণনের কাজ করে চলেছে। সার, কীটনাশক ঔষধ, বীজ প্রভৃতি সরবরাহ করা ছাড়াও প্রাথমিক সমিতিগুলি ব্লক স্তরে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন ও বিপণন পরিচালনা করে।

ভোগ্যপণ্য ক্রেতা সমবায় ঃ গত ৭ বছরে ভোগ্যপণ্যের সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য ভোগ্যপণ্য ক্রেতা সমবায় সমিতির সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে এইরূপ প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ছিল ২৪। ১৯৮২-৮৩ সালে তা পৌঁছায় ১৩১-এ। এই সমিতিগুলির মাধ্যমে ১৯৭৬-৭৭ সালে ১৯৭.০৫ লক্ষ টাকার পণ্য লেনদেন করা হয়। ১৯৮২-৮৩তে হয় ২,৫৫১.১৩ লক্ষ টাকার।

দোহ্ সমবায় সমিতি ঃ পশ্চিমবঙ্গ সমবায় দুগ্ধ উৎপাদন ফেডারেশন দোহ্ সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। এ পর্যন্ত ৩২,০০০ দুগ্ধ ব্যবসায়ী এবং ১.২০ লক্ষ দুগ্ধবতী গাই সমবায় সমিতিগুলির আওতায় এসেছে। দ্বিতীয় অপারেশন ফ্লাড প্রকল্পের অধীনে ৮ লক্ষ দুগ্ধবতী গাই এবং ৪ লক্ষ দুগ্ধ ব্যবসায়ীকে দোহ্ সমবায়ের আওতায় আনার একটি পরিকল্পনা আছে।

আবাসন সমবায় ঃ পশ্চিমবঙ্গের আবাসন সমস্যার সমাধানের জন্য বামফ্রন্ট আমলে আবাসন সমবায় আন্দোলন জোরদার করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে রাজ্যে প্রাথমিক আবাসন সমবায়ের সংখ্যা ছিল ৬৯৫। ১৯৮৩ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১,৪১০। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ হাউজিং ফেডরেশন লিমিটেড ১৯৭৭ সালে ৬,৮৮,৭৯৪ টাকা লাভ করে।

১৯৮৩ সালে লাভের পরিমাণ হয় ১৭,৯১,৬৯০ টাকা।

এই সমস্ত সাফল্য ছাড়াও ১৯৭৭ থেকে '৮১ পর্যন্ত রাজ্যে তন্তুবায় সমিতির সংখ্যা ১,১৬৯ থেকে ১,১৯২-এ পৌঁছেছে। সদস্য তাঁতশিল্পীর সংখ্যা ৫৩,৭২৭ থেকে বেড়ে ৬৪,২২২এ পৌঁছেছে। ঐ সময়ের মধ্যে ট্রান্সপোর্ট কো-অপারেটিভ সমিতির সংখ্যা ৩২২ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৫১। সদস্য সংখ্যা ১৩,৭৯০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৭,৬৪২। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত লেবার কন্ট্রাকটর কো-অপারেটিভ সমিতির সংখ্যা ৫৫৯ থেকে ৬৮৪-এ দাঁড়িয়েছে। সদস্য সংখ্যা ২৫,২৮১ থেকে হয়েছে ২৯,০৪৫।

রাজ্যের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষদেরও সমবায় আন্দোলনে শরিক করে তুলতে একাধিক সমবায় সমিতি গঠন করা হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যের প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা ৭৫০। সদস্য সংখ্যা ৭৫ হাজার। এছাড়াও নতুন নতুন ক্ষেত্রে সমবায় গড়ে উঠছে। বর্তমান সময়ে এগুলির মধ্যে পর্যটন, চলচ্চিত্র নির্মাণ, নদী পরিবহণ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অ-কৃষি ক্রেডিট সোসাইটি

	১৯৭৭	১৯৮৩
১। সোসাইটির সংখ্যা	১,৬৪৯	২,২৩৫
২। সদস্য সংখ্যা	১৩,৫৬,৬৭০	১৭,২১,০০০
৩। জমার পরিমাণ	৬৯,৩২,৫৮,০০০ টা:	১৩২,৭৯,৬৫,০০০ টা:
৪। প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ	৭১,২৭,০৮,০০০ টা:	১০৫,৮৬,৭২,০০০ টা:

একটি ক্রেতা সমবায় বিপণি

সমবায় চিত্র

	১৯৭৭			১৯৮১		
	সোসাইটির সংখ্যা	সদস্য	মূল ধন লক্ষ টাকা			
	১	২	৩	১	২	৩
১। তাঁতশিল্প (হস্তচালিত)	১,১৬১	৫৩,৭২৭	২৭৩.৩৭	১,১৯২	৬৪,২২২	৪২৯.২৮
২। রেশম বয়ন শিল্প	৩৩	১,৬৩৭	৫২.৫০	৮১	৩,৫৯১	১৫৩.২০
৩। পরিবহণ	৩২২	১৩,৭৯০	১৫৭.৮১	৩৫১	১৭,৬৪২	১৮৯.৭৭
৪। বেকার এঞ্জিনিয়ার	৪৮১	৪,৩৪০	১৪৩.৫৫	৫৩৫	৬,০৯৩	২৭১.১২

স্থানীয় শাসন ও নগর উন্নয়ন

বামফ্রন্ট আমলে রাজ্য সরকারের এই বিভাগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল ৮৭টি পৌরসভার নির্বাচন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে এগুলির পরিচালনভার অর্পণ। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে দীর্ঘকাল ধরে নানা অজুহাতে এইসব সংস্থায় নির্বাচিত বোর্ড বাতিল করে দিয়ে এবং নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন না করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করা হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার শুধু সেই খর্ব করা অধিকার ফিরিয়ে দেয়নি, বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন মারফত পৌরসভাগুলির হাতে আগের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা অর্পণ করেছেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে আরো প্রসারিত করার জন্য ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার পরেই শহরাঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন পৌরসভাকে বাড়তি আর্থিক সাহায্য দান, নতুন নতুন পৌরসভা স্থাপন প্রভৃতি

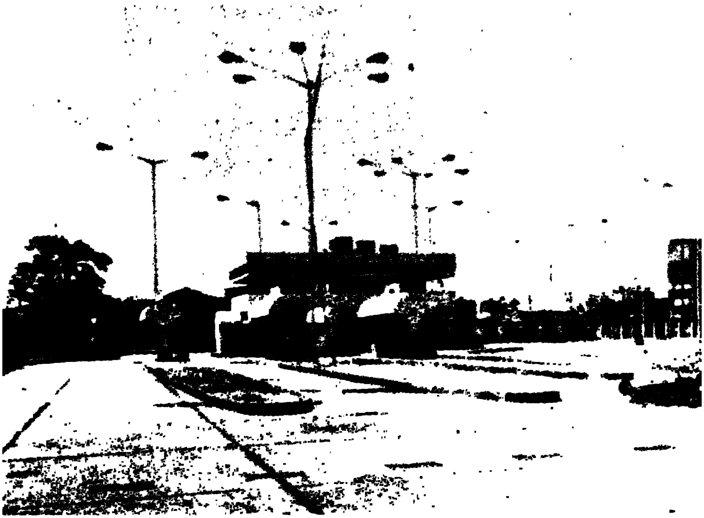

উল্টাডাঙ্গায় নবনির্মিত বাস টার্মিনাস

একাধিক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই আমলে ১৪টি নতুন পৌর সংস্থার জন্ম হয় এবং সব মিলিয়ে রাজ্যে মোট পৌর সংস্থার সংখ্যা ১১১। আরো ১১টি এলাকাকে পৌর এলাকা বলে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। অনেকগুলি নোটিফায়েড এরিয়া এবং টাউন কমিটিকে পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় পরিণত করার প্রস্তাবও বিবেচিত হচ্ছে। বামফ্রন্ট আমলে কলকাতা ও হাওড়া কর্পোরেশনকে নতুন আইন মারফত আরো অধিক ক্ষমতা দিয়ে নতুন চিন্তাধারার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়া হয়েছে। নতুন আইন অনুযায়ী জুলাই মাসে হাওড়ায় নির্বাচন হচ্ছে এবং কলকাতাতেও

চলতি বছরেই নির্বাচন হবে। ইতিমধ্যে গার্ডেনরিচ, সাউথ সুবার্বন, যাদবপুরও কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকারই সর্বপ্রথম মিউনিসিপ্যাল ফিন্যান্স কমিশন গঠন করে এবং এই কমিশনের সুপারিশমত বিভিন্ন পৌরসভার (কলকাতা কর্পোরেশন সহ) ১৯.৭৪ কোটি টাকার ঋণ মকুব করা হয়। সেন্ট্রাল ভ্যালিউয়েশন বোর্ড গঠন করে কলকাতা সহ বিভিন্ন পৌরসভার সম্পত্তির নব মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, নাগরিক জীবনের বহুমুখী সমস্যার মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন পৌরসভাকে তাদের আর্থিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য ২২১ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। খাটা পায়খানা স্যানিটারি পায়খানায় পরিণত করার জন্য ৭০ লক্ষের বেশি টাকা দিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রমোদ করের ৫০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট এলাকার পৌর সংস্থাকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া পানীয় জল সরবরাহ, বস্তী উন্নয়ন, সড়ক যোগাযোগ,বাজার উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার বহুমুখী কর্মসূচি রূপায়ণের উদ্যোগ নিয়েছে। পে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন পৌর সংস্থার কর্মচারীদের জন্য সংশোধিত বেতন হার ও পেনশন প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮৪-৮৫
১। আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ	১৫,৫৮,৮৩,০০০ টা.	৫৭,৭৪,৫৫,০০০ টা.
২। মোট পৌরসভার সংখ্যা	৯৪	১১১

স্থানীয় শাসন ও নগর উন্নয়নের বিবরণ

মৎস্য

মাছ পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রিয় খাদ্য। এরাজ্যে মাছের বার্ষিক চাহিদা ৫.৭ লক্ষ টন। সেক্ষেত্রে বার্ষিক উৎপাদন মাত্র ৩.৭ লক্ষ টন। ঘাটতি মেটানোর জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় অন্য রাজ্য থেকে আমদানির উপর। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বামফ্রন্ট সরকারের তিনটি নীতি হল: ১) মাছ চাষের ক্ষেত্রে উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার, ২) মাছ চাষীকে চারা মাছ সরবরাহ এবং মাছ উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে তাঁকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, ৩) মাছ-চাষীদের আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং সমুদ্র থেকে মাছ ধরতে উৎসাহ দান।

১৯৭৭-এর পরবর্তী সময়ে উন্নত উপায়ে চারা পোনার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নিবিড় মাছ চাষ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এই উদ্দেশ্য মাছ চাষে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়ে তুলতে শিক্ষিত বেকার, মাছ চাষী ও জেলে সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একাজে পঞ্চায়েতের সাহায্য গ্রহণ করা হচ্ছে। ৩০৬টি ব্লককে 'ফিসারী ব্লক' হিসাবে চিহ্নিত করে মাছ চাষের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুকুরেও উন্নত উপায়ে মাছ চাষের জন্য সরকারি উদ্যোগে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অব্যবহৃত হাজামজা পুকুরে যৌথভাবে মাছ চাষে উৎসাহ দেওয়ার জন্য মাছ চাষীদের নিয়ে বিভিন্ন সমিতি গঠিত হয়েছে। গত চার বছরে গঠিত এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ২,৬৩৩টি। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২৮ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। দেশের চারা পোনার ৭৫ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয়। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় আংশিক ব্যবহৃত প্রায় ৩৪ হাজার হেক্টেয়ার জলাভূমিকে মাছ চাষ প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দশ হাজার হেক্টেয়ার জলাভূমিতে একাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যের ৫৫টি আদিবাসী পরিবারকে এক একর করে জলাভূমির স্বত্ব ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে ঝরনায় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের আর্থিক সাহায্য ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে দরিদ্র মাছ চাষীদের মিনিকিট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। ১৯৮২-৮৩তে সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য কাঁথি ও দীঘা উপকূলে মোট ৬৯টি ধীবর সমিতিকে ৫টি যন্ত্রচালিত

নৌকা, ৩১১টি দেশী নৌকা ও ৩২০টি মাছ ধরার জাল দেওয়া হয়েছে। এতে মোট খরচ হয়েছে ১৩.৯৬ লক্ষ টাকা। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। ২৪-পরগনার রায়চকে গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার ট্রলারের জন্য মৎস্য বন্দর চালু হয়েছে, ফ্রেজারগঞ্জে অনুরূপ একটি বন্দর ২২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে। এছাড়া, শংকরপুরে ১৬৮.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজ্য সরকার আর একটি বন্দর নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছে। সুন্দরবনের নোনা জলে মাছ ধরার জন্য ১৯৮০ সাল থেকে ৭৫ শতাংশ ব্যাংক ঋণ এবং ২৫ শতাংশ ভরতুকি হিসাবে দেওয়া হচ্ছে। হেনরি দ্বীপে ১০০ হেক্টেয়ার জমিতে নোনা জলে মাছের ভেড়ি তৈরি করা হয়েছে।

মাছের বিরাট চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ও যোগান অপ্রতুল। সেজন্য উৎপাদনের উপায় সম্প্রসারণের দিকে আরও বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

আইন ও শৃঙ্খলা

সদাজাগ্রত গণতান্ত্রিক চেতনা, সরকারের অতন্দ্র সতর্কতা ও প্রশাসনিক দৃঢ়তা পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন জোরদার করতে সক্ষম হয়েছে। যখন দেশের অন্যান্য অংশে সাম্প্রদায়িক ও বিভেদকামী শক্তিগুলি মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে তখন এই রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মানুষ নিরুপদ্রবে ও সসম্মানে স্বকীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পালনের মধ্যে সুস্থ জীবনযাপন করার অবকাশ পাচ্ছেন। দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষ এখানে সংগঠিত অপরাধ ও অত্যাচারের শিকার হন না। উগ্রপন্থী হঠকারিতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জনবিরোধী প্রয়াস রাজ্য প্রশাসন সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে । সাধারণ জীবন প্রবাহ বিঘ্নিত করার দুষ্কৃতকারীদের অপচেষ্টা দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে।

নৈরাজ্য, সন্ত্রাস স্তব্ধ করা হয়েছে; নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্ন জীবনযাপন সুরক্ষিত। সমাজবিরোধী কার্য-কলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মর্যাদার আসনে মানুষ প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় উন্নততর।

অনুসৃত নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে এ রাজ্যে কোনওরকম নিবর্তনমূলক আটক আইনের প্রচলন করা হয়নি। প্রচলিত সাধারণ আইনের নির্ভীক ও ন্যায্য প্রয়োগের মাধ্যমে আইন-ভঙ্গকারী অপরাধী ও সমাজবিরোধীদের দমন করা সম্ভব—একথা রাজ্য সরকার প্রমাণ করেছে। এ রাজ্যে অপরাধ ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপের হার সাধারণভাবে নিম্ন-মুখী। সমগ্র দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কট ও ক্রমক্ষীয়মাণ আইনানুবর্তিতার প্রেক্ষাপটে এই সাফল্য অধিকতর আশ্বাসপ্রদ। সুশৃঙ্খল পরিবেশ পারস্পরিক সহনশীলতা বাড়াতে ও সৃজনশীল সুস্থ সংস্কৃতির বাতাবরণ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলগুলি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি কর্মসূচি অনুযায়ী আন্দোলনে ব্যাপৃত থেকেছে। মত প্রকাশের এই ব্যাপক স্বাধীনতা আইনশৃঙ্খলার স্থিতিশীলতারই নিদর্শন। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে পুলিস-প্রশাসনের হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়েছে। গণতন্ত্রের ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি অপরাধমূলক ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আইনের শাসন সম্পূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত। পুলিস-প্রশাসন নির্ভীকভাবে কাজ করতে পারে। বামফ্রন্টের শাসন ছাড়া গণতন্ত্র অন্য কোথাও এতটা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।

স্বরাষ্ট্র (কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার)

প্রশাসনিক কাজকর্মের সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন এবং উন্নয়নের কাজকর্ম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি গঠন করে । এই কমিটির মোট ৯১টি সুপারিশের মধ্য থেকে ২১টি সুপারিশ গ্রহণ করে সেগুলি কার্যকরী করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নদিয়া জেলার কল্যাণী এবং বাঁকুড়া জেলার খাতরায় দুটি নতুন মহকুমা গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন অফিসের স্থান সংকুলানের জন্য গত সাত বছরে বামফ্রন্ট সরকার ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহ নির্মাণ করেছেন। কলকাতায় অফিসের কাজের জন্য আরো কয়েকটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করা হচ্ছে। মফঃস্বলেও এই ধরনের ২৮টি ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন, মহার্ঘভাতাও অন্যান্য সুযোগ কোন রাজ্য সরকারের আমলে এই হারে বাড়েনি।

সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগসুবিধা এবং বিভিন্ন বিভাগে তাঁদের বদলি সহজতর করার

জন্য সুসংহত ক্যাডার প্রথা চালু করা হয়েছে। কর্মচারীদের কাজকর্মের যথার্থ মূল্যায়নের সুবিধার্থে 'ওপেন পারফরম্যান্স রিপোর্টিং' প্রথা সরল করা হচ্ছে।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বিধান নগরে আবাসিক সুবিধাসহ একটি প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে শুধু রাজ্যের উচ্চ পদস্থ অফিসারদেরই নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের পদস্থ অফিসার-দেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

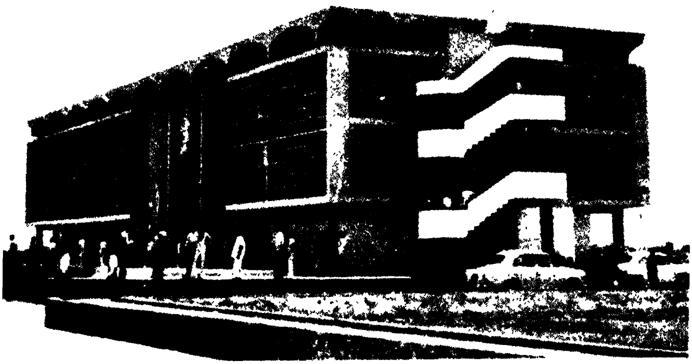

বিধাননগরে প্রশাসন-প্রশিক্ষণ ভবন

কারা

কারাগারের পারবেশ হবে বন্দাদের মানসিক সংস্কারের সহায়ক। এটাই আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীদের মত। এই উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে একটি কোড রিভিশন কমিটি গঠন করে। বর্তমানে এ রাজ্যে ৫টি সেন্ট্রাল জেল, ১১টি ডিস্ট্রিক্ট জেল, ৫টি স্পেশাল জেল, ৩১টি সাব-জেল ছাড়া ১টি করেকসন্যাল ইনস্টিটিউট, ১টি ওয়ার্ডস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ১টি মেন্টাল হেল্‌থ ইনস্টিটিউট রয়েছে।

বর্তমানে রাজ্যের জেলগুলিতে বন্দীর সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। বামফ্রন্ট আমলে বন্দীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় বিচারাধীন ও দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীদের আলাদা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বন্দীদের সম্পূর্ণ আলাদা রাখা সম্ভব হয়েছে। দাগী আসামীদের অন্যান্য বন্দীদের থেকে পৃথক রাখারও ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমান সরকার মহিলাদের জন্য আলাদা কারা স্থাপনের জন্য ইস্টার্ন বাইপাসের কাছে ৩০ একর জমি ঠিক করে রেখেছেন।

বারাসাতের ইনস্টিটিউট অব করেকসন্যাল সার্ভিসে-সে ১২২ জন ভবঘুরে কিশোর রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালে এই প্রতিষ্ঠানের একটি কিশোর মাধ্যমিকে ৫টি বিষয়ে লেটারসহ প্রথম বিভাগে পাস করে।

১৯৮৩ সালের জুন মাসে আলিপুর স্পেশাল জেলে 'ইনস্টিটিউট অব সেন্ট্রাল হেলথ্' স্থাপিত হয়। বর্তমানে এখানে প্রায় ২০০ জন উন্মাদ রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের প্রতিটি জেলে কয়েদীদের নিয়ে গঠিত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলের বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালিত হয়। বামফ্রন্ট আমলে কয়েদীরা আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার বেশি সুযোগ পাচ্ছে।

উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একমাত্র রাজ্য যেখানে সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট স্পেশাল জেলে বিচারাধীন বন্দীরা কাজের পরিবর্তে মজুরি পাচ্ছে। মুক্তির পর তারা যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার জন্য তাদের বিভিন্ন কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

বামফ্রন্ট সরকারের গঠিত জেল কোড রিভিশন কমিটির সুপারিশক্রমে লালগোলা স্পেশাল জেলকে মুক্ত কারায় পরিণত করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

বিচার

বিলম্বিত বিচার মানুষকে অশেষ দুর্গতির মধ্যে ঠেলে দেয়—একথা মনে রেখেই বামফ্রন্ট সরকার, ১৯৭৭ সালে শাসনভার গ্রহণ করার পর, বকেয়া মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য রাজ্যে ২৯টি নতুন আদালত স্থাপন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হাওড়া ও বসিরহাটে অতিরিক্ত জুডিসিয়াল কোর্ট এবং ডায়মন্ডহারবারে সাবজজ কোর্ট স্থাপন। জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং এবং মালদহ—পশ্চিম দিনাজপুর সংযুক্ত জেলা আদালত দুটি বিভক্ত করে চারটি জেলার জন্য পৃথক আদালত স্থাপন করা হয়েছে। এসেনসিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ২৪টি নতুন আদালত এবং ২৪ জন অতিরিক্ত বিচারকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। হাইকোর্টে জমে যাওয়া মামলার সংখ্যা কমাতে নগর দেওয়ানি আদালতের আর্থিক এক্তিয়ার ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ১৯৪৯ সালের ফৌজদারি আইন সংশোধিত হয়েছে। উত্তর বঙ্গের জনসাধারণের সুবিধার্থে জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ স্থাপনের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। সরকার এ ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টের সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছে। জনসাধারণের প্রয়োজনের

সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গত সাত বছরে বামফ্রন্ট সরকার নতুন ১২টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস খুলেছে। এছাড়া বিবাহ রেজিস্ট্রেশনে উৎসাহদানের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, বেশ কিছুসংখ্যক ম্যারেজ অফিসার, মুসলিম ম্যারেজ অফিসার ও কাজী নিয়োগ করা হয়েছে। সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষকে বিনা ব্যয়ে আইনগত সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮০ সালে এক প্রকল্প চালু করে। শহরাঞ্চলে বার্ষিক ৭,০০০ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে ৫,০০০ টাকার অনুর্ধ্ব আয়বিশিষ্ট মানুষ এই প্রকল্প অনুযায়ী আইনগত সাহায্য ও পরামর্শ পেতে পারেন। দেওয়ানি ও দায়রা আদালতের পিস রেটেড টাইপিস্ট-কপিস্টরা বামফ্রন্ট আমলে সরকারি কর্মচারি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

গত সাত বছরে ৫,৩৯০টি রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে ১৯৪৭-৭৭ সাল পর্যন্ত একটিও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি।

রাজনৈতিক বন্দী এরাজ্যে কেউই নেই। নারী, শিশু, শ্রমিক, বর্গাদার ও অন্যান্য সব অংশের মানুষের আইনগত অধিকার নিয়ে সহজ ভাষায় পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের প্রচলিত আইনকানুন সম্পর্কে, অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার কাজ চলেছে। বাংলায় সংবিধান প্রকাশ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

তথ্য ও সংস্কৃতি

জনগণের অকুন্ঠ সমর্থন ও শুভেচ্ছা নিয়ে পশ্চিমবঙেগর বামফ্রন্ট সরকার সাত বছর আগে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে। কিন্তু ভারতের মত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যেখানে আর্থিক, প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের কুক্ষিগত, সেখানে একটি রাজ্য সরকারের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের জনগণের ন্যূনতম চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রচেষ্টার সঙেগ সঙেগ সাধারণ মানুষের সমাজ পরিবর্তনের মৌলিক সংগ্রামে সহায়তা করাই বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান লক্ষ্য। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সংগ্রামী চেতনা ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন গণসংযোগ, জনশিক্ষা এবং সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার। এই দিকে লক্ষ্য রেখে বামফ্রন্ট সরকার গত সাত বছর ধরে জনগণের সঙেগ নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও

তাঁদের বিশ্বাস ও সহযোগিতা অর্জন করে রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কায়েমী স্বার্থবাহী বহু সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজ্যের জনগণের মধ্যে সঠিক তথ্য ও সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা প্রসারের জন্য গত সাত বছরে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যা এই রাজ্যে নজিরবিহীন।

জনসংযোগ

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ গ্রামবাসী। সুতরাং স্বভাবতই বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ তথ্য সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলার কাজে বিশেষ জোর দিয়েছে। ১৯৭৭ সালের আগে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মহকুমা স্তরের নিচে কোন গ্রামীণ তথ্য সংগঠন ছিল না। এই সাংগঠনিক দুর্বলতা লক্ষ্য করে ব্লক পর্যায়ে জনগণের প্রতিনিধিমূলক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক পরিবেষণের জন্য ৯০টি ফিল্ড ওয়ার্কারের পদ করা হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে তথ্য চিত্র, হোর্ডিং এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে তথ্য প্রসারে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে জেলা ও মহকুমা তথ্য সংস্থার সঙ্গে মোট ৯০টি শ্রুতি-চাক্ষুষী ইউনিট তথ্য চিত্র প্রদর্শনীর কাজে নিয়োজিত আছে।

গ্রামীণ তথ্য সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য জেলা স্তরে ১৬টি ফিল্ড ইনফরমেশন সহায়কের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আঞ্চলিক তথ্যসংস্থা পুনর্বিন্যাস করে উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে।

বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে তথ্য সম্প্রসারণের জন্য গত সাত বছর মোট ২,৩৮৪টি বেতার গ্রাহক যন্ত্র পল্লী বেতার পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থাপিত হয়েছে। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মোট ১,৯৮৪টি বেতার গ্রাহক যন্ত্র এই পরিকল্পনায় স্থাপিত হয়েছিল।

দূরদর্শনের মাধ্যমে তথ্য প্রসারের জন্য গত সাত বছরে মোট ১৬৯টি টি ভি সেট সরকারি সাহায্যে স্থাপিত হয়েছে। ১৯৭৭ সালের আগে এই পরিকল্পনায় স্থাপিত টি ভি সেট-এর সংখ্যা ছিল ২২৬টি।

১৯৭৭ সালের আগে মহকুমা তথ্যকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৫টি। আরও নতুন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। বর্তমান সংখ্যা ২২। এছাড়া উত্তরবঙ্গে চা বাগান এলাকার মজদুর শ্রেণীর মধ্যে তথ্য সম্প্রসারণের জন্য স্থাপিত হয়েছে ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা সহ তিনটি তথ্যকেন্দ্র-মাল, বীরপাড়া ও বাগডোগরায়। আসানসোল এলাকার কয়লাখনি শ্রমিকদের জন্য অনুরূপ দুটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে রাণীগঞ্জ ও অন্ডালে।

শিলিগুড়ি ও আসানসোলে দুটি রাজ্য স্তরের তথ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে। শিলিগুড়িতে আধুনিক মঞ্চ ব্যবস্থা সংবলিত একটি প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের কাজ চলছে। রাজ্যের বাইরে বামফ্রন্ট সরকারের বক্তব্য ও কর্মধারা সম্পর্কে তথ্য পরিবেষণের জন্য মাদ্রাজ, কটক ও আগরতলায় তিনটি তথ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক জনসংযোগ-কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তথ্য, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র শাখাগুলির কাজ সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের জন্য এই বিভাগ পুনর্গঠিত হয়েছে। জনসংযোগের মাধ্যমগুলি অধিকতর কার্যকরী করে তোলার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন-প্রকাশ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলার ক্ষুদ্র সংবাদপত্র এবং অন্যান্য সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্র-পত্রিকায় অধিক পরিমাণে বিজ্ঞাপন বণ্টনের নীতি গ্রহণ করায় জনগণের মতামত প্রকাশ ও সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভাগীয় পত্র-পত্রিকার জনপ্রিয়তা এবং প্রচার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্প্রসারিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে তথ্য প্রসারের কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য বার্তা সংস্থাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। প্রদর্শনী শাখার কাজ সম্প্রসারিত হয়েছে এবং রাজ্যের বাইরে

বহু সংখ্যক প্রদর্শনী আয়োজিত হচ্ছে। মৌলালী যুবকেন্দ্রে স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর একটি স্থায়ী প্রদর্শনী স্থাপিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করে তোলার দিকে বামফ্রন্ট সরকার সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। এই বিভাগের নামও পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ।

এই বিভাগের উদ্যোগে ১৯৮০-৮১ সালে গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য লেখকদের অনুদান দেওয়ার একটি প্রকল্প প্রবর্তিত হয়। বিশেষ করে তরুণ ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখকদের বই প্রকাশে সহায়তা করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। বেশ কিছু প্রয়াত এবং প্রতিষ্ঠিত লেখকের গ্রন্থের জন্যও এই প্রকল্পে অনুদান দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৯০ জন লেখক এ বাবদ ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার মতো অনুদান পেয়েছেন। এই বিভাগের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা প্রায় ২০০। বইগুলির দামও কম। এই প্রকল্প নিঃসন্দেহে প্রকাশনা জগতে এক শুভ প্রভাব ফেলেছে। প্রেমচন্দের নির্বাচিত রচনাবলী বাংলায় প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই বিভাগ থেকে দুঃস্থ নাট্য ও যাত্রাশিল্পী, চিত্র ও ভাস্কর্যশিল্পী ও সংগীতশিল্পীদের আর্থিক সাহায্য

দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। গত ছয়টি আর্থিক বছরে মোট ৭২ জন চিত্র ও ভাস্কর্যশিল্পী ২০২ জন সংগীতশিল্পী এবং ২৪৩ জন নাট্যশিল্পীকে এ বাবদ মোট ৬,৪১,৫০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া এই বিভাগ থেকে এ পর্যন্ত ১৪৯টি নাট্যগোষ্ঠী, ৫৭টি সংগীত প্রতিষ্ঠান এবং ১৪টি শিল্পসংস্থাকে মোট ১২ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে উৎসাহ দানের জন্য এ পর্যন্ত ২৫ জনকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

নাটক ও যাত্রার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রযোজনা, পরিচালনা, অভিনয়, রচনা, সুরারোপ প্রভৃতির জন্যও প্রতি বছর অনেকগুলি করে পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

নাটকের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ দশ হাজার টাকা মূল্যের দীনবন্ধু পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ছাড়া আছে অনুরূপ মূল্যের অবনীন্দ্র পুরস্কার ও আলাউদ্দিন স্মৃতি পুরস্কার। শিল্প ও ভাস্কর্য এবং সংগীতের জগতে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ঐ পুরস্কার দুটি প্রদত্ত হয়ে থাকে। একটি আর্ট গ্যালারি নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

নাট্যগোষ্ঠীগুলির অভিনয়ের সুবিধার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় গিরিশচন্দ্র ও মধুসূদনের নামাঙ্কিত মঞ্চ নির্মাণের কাজ চলছে। এ ছাড়া জেলায় জেলায় নাট্যোৎসব আয়োজিত হয়ে থাকে। কলকাতায় একটি

যাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হয়। দিল্লীতে বাংলা নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে পর পর কয়েক বছর ধরে। সংগীতের ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মকাণ্ড নির্বাহের জন্য রাজ্য সংগীত অ্যাকাডেমী গঠন করা হয়েছে।

লোকসংস্কৃতি চর্চায়ও সরকারের মনোযোগ রয়েছে। জেলায় জেলায় লোকসংস্কৃতি উৎসব আয়োজিত হয়ে থাকে। বেহালায় একটি সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। লোকসংস্কৃতির ব্যাপারে একটি স্বতন্ত্র পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে।

সত্যজিৎ রায় ও ভারতের অন্যান্য বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালকরা বামফ্রন্ট সরকারের সহায়তায় চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন, যা দেশে বিদেশে পুরস্কার ও অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। এরকম দৃষ্টান্তও অন্য কোন রাজ্যে নেই।

এইভাবে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে রাজ্য সরকারের কর্মধারা অব্যাহত আছে।

ক্রীড়া

১৯৭৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গ্রামগঞ্জের অসংখ্য ছেলেমেয়েকে খেলার অঙ্গনে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। সাঁতার, এ্যাথলেটিকস, ভলিবল, কাবাডি, খো-খো, ফুটবল প্রভৃতি স্বল্প ব্যয়ের খেলাগুলিকে বিশেষভাবে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। খেলাধুলোর প্রসার ছাড়াও খেলার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়দের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তোলা হচ্ছে। ক্রীড়া সংগঠনগুলিকে দেওয়া হচ্ছে নানারকম আর্থিক সাহায্য। তরুণ ক্রীড়া প্রতিভাকে উৎসাহিত করার জন্য রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ ক্রীড়া মেধা বৃত্তি চালু করেছেন। গত আর্থিক বছরে ষাট জন ছেলেমেয়ে এই কর্মসূচিতে বাৎসরিক ৯০০ টাকা করে পেয়েছে।

এসব ছাড়াও ৩টি ঘেরা মাঠের সমস্ত কর্মচারিকে স্থায়ী সরকারি কর্মচারিরূপে নিয়োগ করা হয়েছে। জেলা এবং মহকুমায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কর্মসূচিতে নির্মীয়মাণ স্টেডিয়ামের সংখ্যা বর্তমানে ত্রিশেরও বেশি।

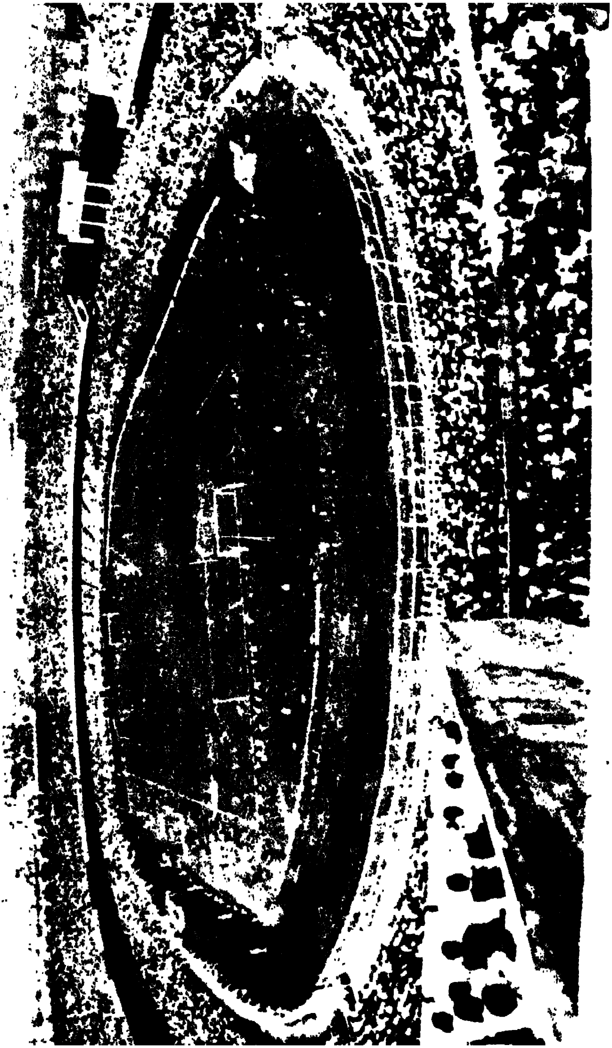

এক লক্ষ কুড়ি হাজার দর্শকাসন বিশিষ্ট ও অত্যাধুনিক এ্যাথলেটিকস-এর সুবিধাযুক্ত লবণ হ্রদের বহু প্রতীক্ষিত স্টেডিয়ামটির উদ্বোধন হয়েছে। ইডেন উদ্যানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে আশি হাজারে নিয়ে আসা হয়েছে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসর বসানোর প্রয়াসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে গত সাত বছরে পঞ্চাশটিরও বেশি জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খেলাধুলোকে গণমুখী করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করতে এবং তরুণ-তরুণীদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে বামফ্রন্ট সরকারের ক্রীড়া দপ্তর যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে, আগে কখনই তার তিলমাত্রও হয়নি।

←— বিধান নগরে (সল্ট লেক) নবনির্মিত স্টেডিয়াম

যুব কল্যাণ

দেশের আগামী দিনের প্রাণশক্তি হল যুব সমাজ। এদের সঠিক পথে চালনা করা দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে একান্ত জরুরি একথা মনে রেখেই নির্ধারিত হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের যুব কল্যাণ কর্মসূচি। ১৯৭২ সালে মাত্র ৯৭ হাজার টাকা বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে এই বিভাগের যাত্রা শুরু। উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলে সেই ব্যয়বরাদ্দ এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১৯.৫০ লক্ষ টাকাতে। '৭৭ পূর্ববর্তী কালে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পসহ মাত্র দু-তিনটি প্রকল্পের মধ্যে এই বিভাগের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তনে সেই কাজ হয়েছে আজ বহুমুখী।

	১৯৭৬-৭৭	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
১। আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ	৪১.৯৯	২৫০.০০	৩১৯.৫০
২। ব্লক যুবকরণের সংখ্যা	৪০	৩৩৫	
৩। জেলা যুব আধিকারিক কার্যালয়	০	১৫	

বহুমুখী যুব কল্যাণ চিত্র

পশ্চিমবঙ্গের মত ভারতের আর কোন রাজ্যেই যুবকল্যাণ কর্মসূচিকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এ রাজ্যের সমস্ত ব্লকেই ব্লক যুবকরণ স্থাপিত হয়েছে। প্রতিটি জেলাতেই জেলা যুব আধিকারিক রয়েছেন। এমন সুবিস্তৃত সাংগঠনিক কাঠামো অন্য কোন রাজ্যে নেই।

ভয়াবহ বেকার সমস্যা লাঘবের উদ্দেশ্যে এই বিভাগ প্রান্তিক ঋণসহ প্রায় পাঁচ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এর ফলে ১,৫০০টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৪,২০০ জন যুবকযুবতী নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি আর একটু সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে আরো বহু মানুষের উপকার করা সম্ভব হত। এই বিভাগের আওতায় ১,৫০০টি প্রকল্প মারফত গত সাত বছরে ৪০ হাজার যুবকযুবতী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। এছাড়া, ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০ হাজার তফসিলী ও আদিবাসী যুবক-যুবতীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে রাজ্য যুবকেন্দ্র। এখানে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহ ছাড়াও রয়েছে পাঠাগার, যুব আবাস, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সংবলিত স্থায়ী সংগ্রহশালা

ইত্যাদি। বিভিন্ন জেলা শহরেও একটি করে জেলা যুবকেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতি বছর এই দপ্তর ব্লকস্তরে যুব উৎসবের আয়োজন করছে। জেলা ও রাজ্য স্তরেও যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ এই সব যুব উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বিশ্ব যুব উৎসবেও এই দপ্তর প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। ১৯৮৫ সালে আন্তর্জাতিক যুববর্ষে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীকে নানা কর্মকাণ্ডে শামিল করার প্রস্তুতি শুরু করেছে এই দপ্তর।

গ্রামীণ যুব সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশে এ পর্যন্ত ১৭০টি কমিউনিটি সেন্টার এবং ১৭০টি মুক্তাঙগন মঞ্চ নির্মিত হয়েছে বিগত সাত বছরে।

যুব সমাজের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বামফ্রন্ট আমলে প্রতি বছর ব্লকস্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হচ্ছে, জেলা ও রাজ্য স্তরে আয়োজিত হচ্ছে বিজ্ঞান প্রদর্শনী। বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুরুলিয়াতে এমন একটি স্থায়ী বিজ্ঞান প্রদর্শনী গড়ে তোলা হয়েছে যার নজির ভারতে আর নেই।

এই বিভাগের অধীনে বিহারের রাজগীরসহ ২১টি যুব আবাস রয়েছে—যার সবগুলিই '৭৭ পরবর্তী কালে

তৈরি। এছাড়া গঙগাসাগর, শিলিগুড়ি, বক্রেশ্বরে যুব আবাস তৈরির কাজ সমাপ্তপ্রায়। গত সাত বছরে ১,৮১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬০ হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য আর্থিক সাহায্য পেয়েছে। এবাবত ব্যয় হয়েছে ৩৬,২২,০০০ টাকা। ছাত্র নয় এমন যুবক-যুবতীদেরও ভ্রমণের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। এই বিভাগের উদ্যোগে ১১৯টি বিদ্যালয়ে সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে কয়েক শত টেকস্ট বুক লাইব্রেরি। নিরক্ষরতা দূরীকরণে দার্জিলিং চা-বাগিচা অঞ্চলে এবং হুগলি শিল্পাঞ্চলে ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করছে এই দপ্তর। বিগত সাত বছরে বিভিন্ন ব্লকে ৮০০ খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে, আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে অসংখ্য গ্রামীণ ক্রীড়া সংস্থাকে, ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে ৬৫০টি জিমন্যাসিয়াম, ক্রীড়া সরঞ্জাম কেনার জন্য দেওয়া হয়েছে আরো সাড়ে আঠারো লক্ষ টাকা। ব্লক পিছু তিনটি করে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং প্রতি গ্রামে ন্যূনপক্ষে একটি করে ফুটবল বিনামূল্যে দেওয়ার কর্মসূচি সাফল্যের সঙেগ রূপায়িত করেছে বামফ্রন্ট সরকার। পর্বতাভিযানে উৎসাহ দেবার জন্য এই বিভাগ গড়ে তুলেছে একটি সরঞ্জাম ভান্ডার। যুবকদের মুখপত্র হিসাবে এই দপ্তর পরিচালিত

"যুবমানস" পত্রিকার প্রকাশন নিয়মিত হয়েছে এবং দিন দিন এর আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ঘোষিত যুব-নীতি নেই। নেই অন্য রাজ্যেরও। এই পরিপ্রেক্ষিতে বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যে যুব সমাজ সম্পর্কে এক দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষার কাজে হাত দিয়েছে চলতি বছরে। এ ছাড়া, সাম্প্রদায়িকতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

যুব আবাস — দীঘা

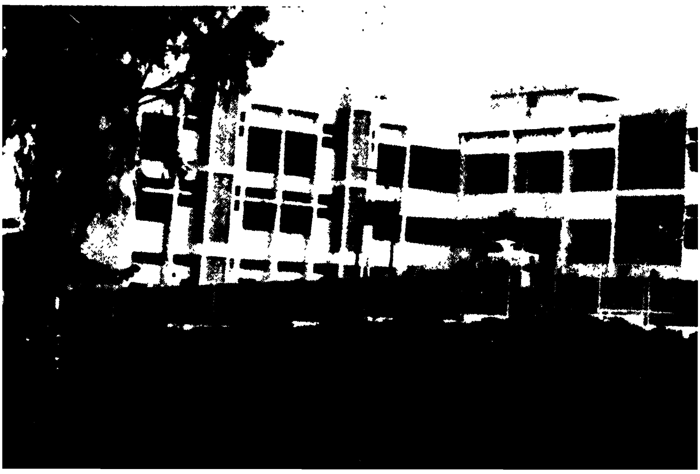

অসামরিক প্রতিরক্ষা

১৯৬৮ সালের ১০ জুলাই ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত 'সিভিল ডিফেন্স অ্যাক্ট' অনুসারে বর্তমান অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত হয়েছে। এই ব্যবস্থাকে প্রতিরক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এবং স্থায়ীভাবে গঠন করবার পরিকল্পনা থাকলেও দেশের আর্থিক অসচ্ছলতা বিবেচনা করে এই সংগঠনকে একটা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

বহিঃশত্রু আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সতর্কীকরণ-ব্যবস্থা, অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, প্রাথমিক চিকিৎসা ও উদ্ধার কার্যে প্রশিক্ষণ প্রভৃতি এবং শান্তির সময়ে বন্যা, খরা অথবা অন্য কোন আপৎকালীন অবস্থায় নানাপ্রকার সমাজসেবামূলক কাজে অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭৭ সালের পর থেকে এই সংস্থার বিষয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয় যাতে একটি স্থানু

সংস্থাকে একটি সচল, কর্মক্ষম ও বহুমুখী প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত করা যায়। বামফ্রন্ট আমলে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব শিল্পোন্নত এবং ঘন বসতিপূর্ণ এলাকাকে অসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

১৯৭৮--১৯৮৩ পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশি স্ত্রী ও পুরুষকে অসামরিক প্রতিরক্ষার প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যে সমস্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি আছে সেখানে প্রায় ৯ হাজার জনকে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবীদের দৈনিক ভাতা ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৩.৩৬ টাকা করা হয়েছে যা সারা দেশে এখন সর্বোচ্চ। স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য একটি কল্যাণ তহবিল স্থাপন করার কথা বর্তমান সরকারের বিবেচনাধীন।

এই বিভাগের কাজকর্মের পরিধি বিস্তৃত করতে ১৯৮০ সালে ১টি নতুন জলশাখা খোলা হয়। ১৯৮২ সালের আগস্ট মাসে ওড়িশার বন্যাত্রাণে এই শাখার কর্মীরা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এসেছেন। ৭ দিনে প্রায় ৪৮, হাজার জলবন্দী মানুষকে উদ্ধার করেছেন ও কয়েক শ' টন ত্রাণসামিগ্রী দুর্গত এলাকায় পৌঁছে দিয়েছেন। ওড়িশার জনগণ ও মুখ্যমন্ত্রী এঁদের কাজের প্রভূত প্রশংসা করেছেন। ১৯৮৩ সালে আসামের বন্যাত্রাণে ঐ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও এই

বিভাগের কাজের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে আন্ত্রিক রোগের প্রকোপের সময় এঁরা জনগণের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন।

বিগত কয়েকটি নির্বাচনের সময় প্রায় ৮৯ হাজার হোমগার্ড আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে তাঁদের যোগ্যতার পরিচয় রেখেছেন।

কর্মরত অবস্থায় নিহত বেশ কিছু হোমগার্ডের পরিবারকে ১ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের অসামরিক প্রতিরক্ষার কাজ আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি রাখা হয়েছে, এ পর্যন্ত যে সমস্ত ব্যয়ের অর্ধেক কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেছেন সে সমস্ত ব্যয়ের ১০০% কেন্দ্রীয় সরকার বহন করুন।

সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকার বাজেটে যে ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করেছেন তার একটি চিত্র দেওয়া হল:-

	অঃ পঃ খাত		হোমগার্ড খাত	
১৯৭৮-৭৯	৩,০৩,৭৩,০০০	টাকা	২,৬৩,৫২,০০০	টাকা
১৯৭৯-৮০	৩,৩৪,৩০,০০০	"	২,৮৮,৯১,০০০	"
১৯৮০-৮১	৪,০৪,১৪,০০০	"	৩,১৮,৪৯,০০০	"
১৯৮১-৮২	৪,৪৫,৭০,০০০	"	৩,৫৪,২৩,০০০	"
১৯৮২-৮৩	৫,২৬,৩২,০০০	"	৫,৩২,৮২,০০০	"
১৯৮৩-৮৪	৫,৭৬,১০,০০০	"	৬,৫১,৮৯,০০০	"

অনুমোদনের অপেক্ষায়

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে এপর্যন্ত ৪১১টি বিবিধ জনকল্যাণমূলক বিল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ২৯টি এখনও রাষ্ট্রপতি/রাজ্যপালের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত ২৯টি বিলের ১০টি ১৯৮১ সালে, ৭টি ১৯৮৩ সালে এবং ১২টি ১৯৮৪ সালে গৃহীত হয়। এছাড়া ১৯৬৯ সালে তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট আমলে গৃহীত ২টি বিলের অনুমোদন এখনও পাওয়া যায়নি।

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে তথ্য অধিকর্তা শ্রী প্রীতীন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত এবং হেডওয়ে লিথোগ্রাফিক্ কোং, পি-২৫৩, সি আই টি. স্কিম-৬, কলিকাতা ৫৪ থেকে মুদ্রিত। ২৯.৬.৮৪/১,০০,০০০

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণঃ রণেন মুখোপাধ্যায়

ভাসমান চিকিৎসা কেন্দ্র

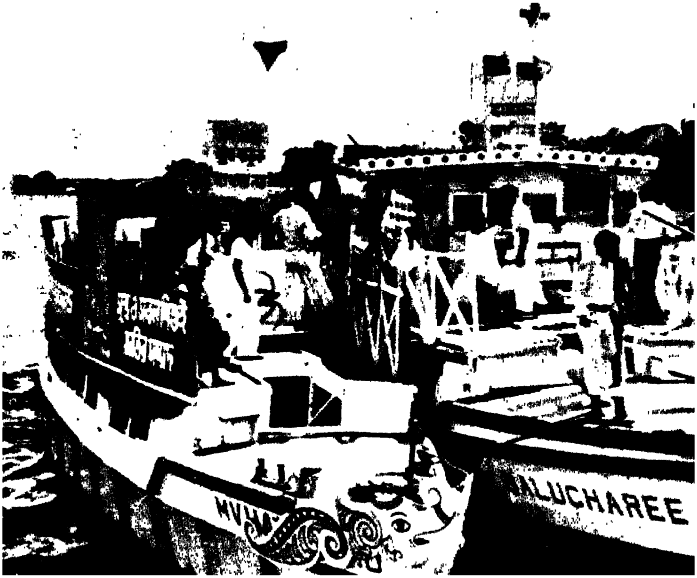

উপরে – তাঁতশিল্পে কর্মরত মহিলা শিল্পী
নিচে – হলদিয়ার সার উৎপাদন কারখানা